স্থির-বিদ্যুৎ

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

প্রাপ্তিস্থান :—
১। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস,
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা
২। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

প্রিণ্টার
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—বেনারস ব্রাঞ্চ

স্থির-বিদ্যুৎ

রায়-সাহেব

শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ,

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস—২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১৯২৮

[মূল্য দেড় টাকা

নিবেদন

বিদ্যুৎ তত্ত্বের প্রথম পুস্তক "স্থির-বিদ্যুৎ" প্রকাশিত হইল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। অতি-অল্পকালের মধ্যে ইহার যে-উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাই বিদ্যুৎ-তত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানেরই শাখা বলিতে হয়। বিদ্যুৎ আজ মানুষের আজ্ঞাবহ হইয়া অসাধ্য সাধন করিতেছে। ঘরে-বাহিরে কাজে-অকাজে ইহার কার্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু ইহার স্বভাব আমাদের অনেকেরই নিকটে অজ্ঞাত। এই অজ্ঞতা আধুনিক যুগে কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই পুস্তকে বিদ্যুতের মোটামুটি তত্ত্বগুলির পরিচয় দিয়াছি। ভাষা যতদূর সম্ভব সরল ও সরস করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি, সাধারণ পাঠক এবং আমাদের ছেলে-মেয়েরা পুস্তক পাঠে বিষয়টি বুঝিতে পারিবেন।

তাপ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিয়া লই। তাই এই সকল শক্তির কার্য্যের সহিত সকলেরই একটু-আধটু পরিচয় থাকে বলিয়া সেগুলিকে বুঝানো সহজ। কিন্তু বিদ্যুতের ক্রিয়াকে উপলব্ধি করার মতো আমাদের বিশেষ ইন্দ্রিয় নাই। বিদ্যুৎ শক্তিকে অন্য শক্তিতে,

রূপান্তরিত করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লইতে হয়। কাজেই, বিদ্যুতের কার্য্য বুঝাইতে গেলে পরীক্ষার প্রয়োজন। অনায়াসে এবং স্বল্পব্যয়ে যে-সব পরীক্ষা সম্ভব, এই পুস্তকে কেবল তাহাদেরি বিবরণ দিয়া বিদ্যুতের তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বৈদ্যুত-ধর্ম্মের সহিত চৌম্বক-ধর্ম্মের অনেক মিল আছে। বলিতে গেলে উভয়ই একই সাধারণ ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান; তাই "স্থির-বিদ্যুৎ" পড়িবার পূর্ব্বে পাঠক যদি মৎপ্রণীত "চুম্বক" পুস্তকখানি একবার পড়িয়া লন, তাহা হইলে বিদ্যুৎ-তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

আমাদের দেশের অতি-প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে বজ্রের যে আকৃতি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া স্বনামধন্য শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় পুস্তকের প্রচ্ছদ-পটখানির পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই চিত্রখানি পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, মনে করি। তাই বসু মহাশয়কে এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীমান্ নিশিকান্ত রায়-চৌধুরীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ পুস্তক-প্রকাশে যে সাহায্য করিলেন, তাহার ঋণ অপরিশোধ্য।

শান্তিনিকেতন,
বীরভূম।
পৌষ, ১৩৩০

শ্রীজগদানন্দ রায়

সুচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	প্রথম কথা	১
২।	বিদ্যুৎ-উৎপাদন	৫
৩।	দুই প্রকারের বিদ্যুৎ	১০
৪।	পরিচালক ও অপরিচালক দ্রব্য .	২১
৫।	বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্র	২৮
৬।	বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষ	৩৩
৭।	পরমাণু ও ইলেকট্রন্ .	৪১
৮।	ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের পরিচালন	৪৬
৯।	বিদ্যুতের আবেশ	৫৮
১০।	বিদ্যুতের বল-ক্ষেত্র ও বল-রেখা .	৬৬
১১।	বৈদ্যুত-যন্ত্র	৬৮
১২।	বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র	৭৭
১৩।	আবিষ্ট বিদ্যুতের কতকগুলি পরীক্ষা ...	৮৩
১৪।	বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক	৯৬
১৫।	লীডেন্ জার্	১০৪
১৬।	লীডেন্ জারের ব্যাটারি ..	১১৩
১৭।	বৈদ্যুতিক আন্দোলন .	১২০

বিষয়

১৮। আকাশের বিদ্যুৎ ১২৬
১৯। বজ্রপাত ও মেঘ-গর্জ্জন ১২৮
২০। বজ্র-বারক ১৩৪
২১। বজ্রাঘাতে মৃত্যু ১৩৯
২২। আকাশে বিদ্যুতের উৎপত্তি ১৪২
২৩। বিদ্যুতের শক্তি ১৫৪
২৪। বিদ্যুতের ক্রিয়া ১৬২
২৫। বিদ্যুতের উৎপত্তি ১৬৬

স্থির-বিদ্যুৎ

প্রথম কথা

মানুষ যে-দিন তাহার বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি লইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল, বোধ করি সেই দিন হইতেই তাহারা আকাশের মেঘে বিদ্যুৎ দেখিয়া আসিতেছে। এই বিদ্যুৎকে তাহারা কি মনে করিত, জানিবার উপায় নাই। বোধ করি আগুনই ভাবিত। বিদেশী প্রাচীন পণ্ডিতেরা এক মজার কথা বলিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, মেঘের ভিতরকার কোনো বাষ্প জ্বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। তার পরে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে লোকে আকাশের বিদ্যুৎ ও বজ্র-সম্বন্ধে যে-সব সুন্দর সুন্দর কথা কল্পনা করিত, তাহা বোধ করি তোমরা জানো।

আকাশে যে বিদ্যুৎ আছে, মাটিতেও যে তাহা থাকিতে পারে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে গ্রীস্ দেশের থেল্স্ (Thales) নামক এক পণ্ডিত একটু আভাষ দিয়াছিলেন। পাথরের মতো শক্ত এবং কাচের মতো কতকটা স্বচ্ছ এক জিনিষ মাটির তলায় পাওয়া যায়। ইহার নাম স্ফটিক (Amber)। তোমরা বোধ করি স্ফটিক দেখ নাই। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া গাছপালা মাটির তলায় থাকিলে সেগুলি যেমন কয়লা হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি গাছের আঠা অনেক বৎসর মাটি চাপা থাকিলে স্ফটিক হয়। আমাদের দেশে আগে স্ফটিকের পেয়ালা রেকাবি প্রভৃতি অনেক পাওয়া যাইত এবং সেগুলির দামও ছিল খুব বেশি। বিদেশী কাচের জিনিষের আমদানি হওয়ায় বোধ হয় এখন আর স্ফটিকের আদর নাই। যাহা হউক, গ্রীস্ দেশে এক সময়ে খুব স্ফটিক পাওয়া যাইত। পশম দিয়া ঘষিলে স্ফটিক কাগজের টুক্‌রা প্রভৃতি হাল্‌কা জিনিষকে টানিয়া লয়, এই ঘটনাটি সর্ব্বপ্রথমে গ্রীক্ পণ্ডিত থেল্‌সের নজরে পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহা যে বিদ্যুতের দ্বারা হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই ঘটনার পরে দুই হাজার বৎসর

পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কেহ কোনো খোঁজ-খবর লয় নাই। শেষে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের চিকিৎসক গিল্‌বার্ট সাহেব দেখিয়াছিলেন, পশম ঘষিলে কেবল স্ফটিকই যে হাল্‌কা জিনিষকে টানিয়া ধরে তাহা নয়। ঘষা পাইলে গন্ধক কাচ মোম প্রভৃতি অনেক জিনিষেই ঐ শক্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা যে বিদ্যুতের শক্তি তাহা গিল্‌বার্ট সাহেবও বুঝিতে পারেন নাই। আমেরিকার বড় পণ্ডিত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্‌ই প্রায় দুই শত বৎসর আগে আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া তাহার সহিত এই-সব বিদ্যুতের তুলনা করিয়াছিলেন। ইহার পরেই নানা দেশের লোক বিদ্যুতের উপরে নজর দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের মহাপণ্ডিত মাইকেল ফ্যারাডেই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। ইহার জীবনের ইতিহাস বড় আশ্চর্য্যজনক। তিনি প্রথম জীবনে দপ্তরীর কাজ করিতেন। এখন তিনি সর্ব্বদেশে বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পূর্ব্বের বৈজ্ঞানিকেরা যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলিকে একত্র করিয়া ফ্যারেডে সাহেবই আধুনিক বৈদ্যুত-বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রোথিত করেন। আজ সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়াই বিজ্ঞান এত মহিমময়।

যাহা হউক, ফ্যারাডের অনুগ্রহে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে এত নূতন খবর জানা গিয়াছে যে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। আকাশে যে-বিদ্যুৎ দেখা যায়, গালা বা কাচকে পশম দিয়া ঘষিলে যে-বিদ্যুতের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা দিয়া যে টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্ ও ট্রামগাড়ি চলিতে পারে, সে-কথা সত্তর-আশী বৎসর আগেও কাহারো মনে উদিত হয় নাই। বিদ্যুতের নানা কল যেন ভেল্কি বাজি দেখাইতেছে।

যাহা হউক বিদ্যুতের নানা গুণের এবং তাহার আশ্চর্য্য কাজের কথা একে একে তোমাদিগকে বলিব।

বিদ্যুৎ-উৎপাদন

ফাউণ্টেন্ পেনের হাতলকে রেশমী বা পশ্‌মী কাপড়ে ঘষিয়া কাগজের টুক্‌রার উপরে ধরিলে, সেগুলি লাফাইয়া কলমের গায়ে লাগিয়া যায়। কেবল ইহাই নয়, শীতকালে পশমে-ঘষা পেন্ হইতে চট্ চট্ করিয়া বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গও বাহির হয়। সাধারণ ভল্‌কানাইটের তৈয়ারি চিরুণি দিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইবার সময়েও চিরুণি বিদ্যুৎ-যুক্ত হয়। তখন কোনো হাল্‌কা জিনিষের কাছে ধরিলে, সেই-সব জিনিষ চিরুণির কাছে আসে। এগুলি তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? শীতকালে যখন চারিদিকের বাতাস শুক্‌না থাকে, সেই সময়ে এই পরীক্ষাগুলি অতি-সহজে করা যায়। তোমরা করিয়া দেখিয়ো।

প্রায় দুই শত বৎসর আগে আমেরিকায় বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কথা বোধ করি তোমরা শুন নাই। সেই পরীক্ষার কথা তোমাদিগকে বলিব। আগেই বলিয়াছি, আকাশের মেঘে মেঘে যে-বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়ায়, সে-কালের

লোকে তাহাকে আগুন বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন্ তাহাতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটা প্রকাণ্ড ঘুঁড়ি তৈয়ারি করা হইল এবং ঘুঁড়ির গায়ে লোহার পাত্‌লা শিক বসাইয়া তাহার সঙ্গে ঘুঁড়ির সূতা জোড়া হইল। তার পরে কখন্ মেঘে বিদ্যুৎ দেখা দিবে, তাহারি জন্য ফ্রাঙ্কলিন্ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ মেঘ দেখা দিল, এবং মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। লাটাইয়ের সূতার শেষে এক টুক্‌রা লোহা বাঁধিয়া তিনি ঘুড়িখানিকে উড়াইয়া দিলেন। ঘুড়ি তর্‌তর্ শব্দে আকাশের উপরে উঠিতে লাগিল,—বোধ করি মেঘের কাছে গেল। তার পরে চিরুণিতে পশম ঘষিলে যেমন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, ঠিক সেই-রকম স্ফুলিঙ্গ সূতায়-লাগানো লোহা হইতে বাহির হইতে লাগিল। ফ্রাঙ্কলিনের এই ঘুড়ি উড়ানোকে পাগলের খেয়াল ভাবিয়া সেখানে অনেক লোক জড় হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া গেল। লোকে বুঝিল, ঘষা পাইলে

কতকগুলা জিনিষে যে-বিদ্যুৎ জন্মে, সেই বিদ্যুৎই আকাশের মেঘে মেঘে খেলিয়া বেড়ায়। দুই শত বৎসর আগে ফ্রাঙ্কলিন্ ঘুঁড়ি উড়াইয়া এই রকমে যে-আবিষ্কারটি করিয়াছিলেন, তাহা আজো স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কি-রকমে মেঘে বিদ্যুৎ জন্মে, ফ্রাঙ্কলিন্ তাহার সন্ধান পান নাই। অনেক পরে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে-সব কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

যে লম্বা গালা দিয়া চিঠি-পত্র আঁটা হয়, রেশম ঘষিয়া তাহাকে কাগজের টুক্‌রার উপরে রাখিয়ো।

রেশমে-ঘষা গালা ও কাগজের টুকরা।

দেখিবে, টুক্‌রাগুলি লাফাইয়া গালার গায়ে লাগিতেছে এবং একট পরেই ছিট্‌কাইয়া দূরে যাইতেছে। রেশমের

ঘষা পাইয়া গালা বিদ্যুৎ-যুক্ত হয় বলিয়াই ইহা ঘটে। এই গালাটিকে গায়ের বা মুখের কাছে ধর,—ইহাতে গা ও মুখ শির্-শির্ করিয়া উঠিবে। কেন এ-রকম হয়, বোধ করি তোমরা জানো না। গালায় যে-বিদ্যুৎ আছে, তাহা আমাদের গায়ের উপরকার লোমকে টানিয়া খাড়া করে। তাই এই রকম বোধ হয়। গালার বদলে কাচ, গন্ধক বা এবোনাইটের ডাণ্ডা লইয়া পরীক্ষা করিলেও তোমরা ঠিক একই ফল দেখিতে পাইবে।

তাহা হইলে দেখ, হাল্কা জিনিষকে কাছে টানিয়া আনা বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষের একটা প্রধান গুণ। কোনো জিনিষে বিদ্যুৎ আছে কিনা জানার জন্য বৈদ্যুত-দোলক (Electic Pendulum) ব্যবহার করা হয়। এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবির "C" চিহ্নিত অংশ একটা বাঁকানো কাচের ডাণ্ডা। তাহাতে "F" চিহ্নিত একটি রেশম সূতা বাঁধা আছে এবং তাহার "B" চিহ্নিত জায়গায় মটরের মতো ছোট একটা সোলার কুচি লাগানো রহিয়াছে। ইহারি নাম বৈদ্যুত-দোলক।
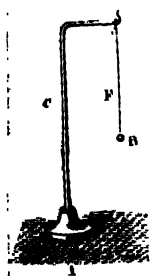
বৈদ্যুত দোলক

ঐ সোলার টুক্‌রার কাছে বিদ্যুৎ-যুক্ত কোনো জিনিষকে আনিলে, সোলা ছুটিয়া উহার গায়ে ঠেকে এবং একটু গায়ে লাগিয়াই ছিট্‌কাইয়া দূরে যায়। তাহা হইলে দেখ, কাচ গালা রবার এবোনাইট্ গন্ধক প্রভৃতি জিনিষকে পশম দিয়া ঘষিলে তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মিল কি না এই পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ জানা যায়।

কাচের নল, রেশমী সূতা এবং সোলা সংগ্রহ করা কঠিন নয়। তোমরা এই-সব জিনিষ দিয়া একটি বৈদ্যুত-গোলক তৈয়ারি করিয়ো। ভল্‌কানাইটের চিরুণি বা ফাউণ্টেন্ পেনের হাতলে পশমী বা রেশমী কাপড় ঘষিলে তাহাতে বিদ্যুৎ জন্মিল কি না, এই সহজ যন্ত্র দিয়া তোমরা অনায়াসে ঠিক করিতে পারিবে।

দুই প্রকারের বিদ্যুৎ

এখানকার ছবিটি লক্ষ্য কর। দেখ তিনটি বৈদ্যুত-দোলক পর-পর সাজানো রহিয়াছে। কাচের ডাণ্ডায় রেশমী রুমাল ঘষিয়া দোলকের কাছে আনিলে কি হয়,
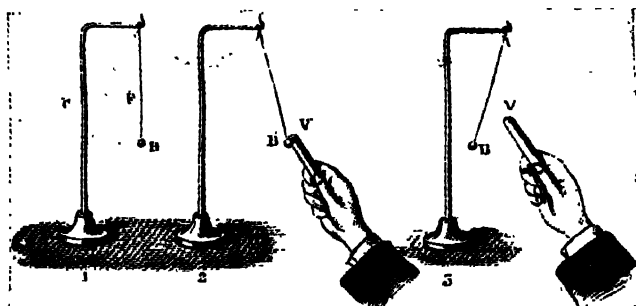
বৈদ্যুত দোলকের পরীক্ষা

তাহা তোমরা আগেই দেখিয়াছ। মাঝের দোলকে তাহাই আঁকা আছে। প্রথমে দোলকের সোলা কাচের গায়ে ঠেকে; তার পরে ছুটিয়া দূরে পালায়। ইহা কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বিদ্যুৎ-যুক্ত বস্তু-মাত্রেই হাল্‌কা জিনিষকে টানিয়া কাছে আনে। তাই কাচ সোলাকে আকর্ষণ

করে। তার পরে যেই সোলা কাচের গায়ে ঠেকিল, অমনি তাহা কাচের বিদ্যুতে পূর্ণ হইল। ইহাতে দুইয়ের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা দিল। তাহা হইলে দেখ, দুইখানি চুম্বকের একই মেরুর মধ্যে যেমন বিকর্ষণ থাকে, তেমনি একই বিদ্যুতে দুইটা জিনিষ বিদ্যুৎযুক্ত হইলে তাহাদের মধ্যে ঠিক সেই রকমেরই বিকর্ষণ প্রকাশ পায়। দেখ, ডাইনের দোলকে তাহাই আঁকা আছে।

আমরা কাচে রেশম ঘষিয়া এই পরীক্ষা করিলাম। তাহা না করিয়া তোমরা যদি গালায় পশম ঘষিয়া পরীক্ষা করিতে, তাহা হইলেও ঠিক একই ফল দেখিতে পাইতে। অর্থাৎ প্রথমে গালার বিদ্যুতে সোলা কাছে আসিয়া গালার গায়ে লাগিত। তার পরে গালা ও সোলা যখন একই বিদ্যুতে পূর্ণ হইত, তখন তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা দিত। এগুলি তোমরা নিজের হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো।

এখন আর একটা পরীক্ষার কথা বলি। রেশম ঘষিয়া কাচে যে-বিদ্যুৎ পাইয়াছ, প্রথমে কাচ ছোঁয়াইয়া দোলকের সোলাকে সেই বিদ্যুতে পূর্ণ কর। তার পরে পশম ঘষিয়া গালার ডাণ্ডায় বিদ্যুৎ

উৎপন্ন কর। তাহা হইলে কাচে এবং গালায় দুই রকমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা গেল। মনে রাখিয়ো, সোলায় কাচের বিদ্যুৎ আছে। এখন বিদ্যুৎ-পূর্ণ গালাকে সোলার কাছে আনিলে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে। তখন এই দুইটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করিবে না। যেই গালাকে সোলার কাছে আনিবে, অমনি তাহাদের মধ্যে আকর্ষণ দেখা দিবে। সুতরাং বলিতে হয়, কাচের বিদ্যুতের সঙ্গে গালার বিদ্যুতের আকর্ষণ হয়।

এই সকল পরীক্ষা হইতে জানা গেল, কাচের বিদ্যুতের সঙ্গে কাচের বিদ্যুতের এবং গালার বিদ্যুতের সঙ্গে গালার বিদ্যুতের বিকর্ষণ আছে। কিন্তু যেই কাচ ও গালার বিদ্যুৎকে কাছাকাছি আনা যায়, অমনি তাহাদের মধ্যে আকর্ষণ দেখা দেয়। চুম্বকের দুই বিপরীত মেরুতে আমরা যে আকর্ষণ দেখিয়াছি, ইহা তাহারি মতো নয় কি?

তাহা হইলে বলিতে হয়, চুম্বকের যেমন দুই মেরু আছে, বিদ্যুতেরও তেমনি দুই জাতি আছে। চুম্বকের একই মেরু যেমন পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, একই জাতির বিদ্যুৎও ঠিক্ সেই রকমে বিকর্ষণ দেখায়।

চুম্বকের দুই বিপরীত মেরু যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তেমনি দুই বিপরীত জাতীয় বিদ্যুতের মধ্যেও ঠিক্ সেই রকম আকর্ষণ দেখা যায়। এখানে দুই জাতীয় বিদ্যুৎ কি-রকমে তৈয়ারি করা হইল, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কাচে রেশম ঘষায় এক জাতি এবং গালায় পশম ঘষায় আর এক জাতি বিদ্যুৎ পাওয়া গেল।

প্রায় দুই শত বৎসর আগে ডফে (Dufay) নামক একজন ফরাসী সৈনিক এই সকল ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহার অনেক পরে ফ্রাঙ্কলিন্ কাচের বিদ্যুৎকে ধন (Positive) এবং গালার বিদ্যুৎকে ঋণ (Negative) নাম দিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রথম এবং দ্বিতীয় রকম বিদ্যুৎকে ধন-বিদ্যুৎ এবং ঋণ-বিদ্যুৎ বলা হইতেছে। অঙ্কে ধন (+) এবং ঋণ (−) চিহ্নযুক্ত সংখ্যার সম্বন্ধ যেমন পরস্পর উল্টা বুঝায়, ধন ও ঋণ-বিদ্যুতের সম্বন্ধও কতকটা সেই রকমেরই উল্টা। কিন্তু কেন কাচের বিদ্যুৎকে ঋণ না বলিয়া ধন বলা হইল, তাহার কোনো হেতু নাই। দুই বিদ্যুতের বিপরীত গুণ প্রকাশ করার জন্যই একটিকে ধন, অপরটিকে ঋণ বলা হইয়াছে। বাড়ীর গোয়ালে একটা সাদা এবং একটা

লাল গরু থাকিলে আমরা যেমন প্রথমটাকে ধলা এবং দ্বিতীয়টাকে পেয়ালা নাম দিই, এই নামকরণ ঠিক সেই রকমের নয়। ধন-বিদ্যুতে (+) ধনের কোনো গুণ নাই এবং (−) ঋণ-বিদ্যুতে ঋণের কোনো গুণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উভয় বিদ্যুতের গুণ পরস্পর উল্টা, কেবল ইহা দেখিয়াই একটাকে ধন-বিদ্যুৎ এবং অন্যটাকে ঋণ-বিদ্যুৎ নাম দেওয়া হইয়াছিল এবং আজও সেই নাম চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আরো কিছু পরে বলিব।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, কাচকে রেশম দিয়া না ঘষিলে ধন-বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। কাচ ও রেশম ছাড়া অন্য দুই জিনিষকে ঘষিলেও ধন-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তেমনি পশম ও গালা ছাড়া অন্য জিনিষ দিয়াও ঋণ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। ফ্লানেল্‌কে রেশম দিয়া, কাঠকে রবার দিয়া এবং গন্ধককে গটাপার্চা দিয়া ঘষিলেও, ফ্লানেল্ কাঠ ও গন্ধকে ধন-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার রবারকে হাত দিয়া, গন্ধককে পশম দিয়া, অথবা রজন-ধূনাকে ফ্লানেল্ দিয়া ঘষিলে, রবার গন্ধক ও রজন-ধূনায় ঋণ-বিদ্যুৎ জন্মে। কাহাকে কি দিয়া ঘষিলে

কোন্ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তাহা তোমাদের মনে রাখার দরকার নাই। কেবল স্মরণ রাখিয়ো, রেশম দিয়া ঘষিলে কাচে যে-বিদ্যুৎ হয় তাহা ধন-বিদ্যুৎ, এবং ফ্লানেল্ দিয়া ঘষিলে গালায় যে-বিদ্যুৎ হয় তাহা ঋণ-বিদ্যুৎ। ইহা মনে থাকিলে বিদ্যুৎযুক্ত কোনো জিনিষে কোন্ বিদ্যুৎ আছে তাহা তোমরা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিবে।

মনে কর, ফ্লানেল্ দিয়া ঘষায় রবারে যে-বিদ্যুৎ হইল, তাহা কোন্ জাতীয় বিদ্যুৎ যেন আমরা জানিতে চাহিতেছি। রেশম দিয়া ঘষায় কাচে যে-ধনবিদ্যুৎ হয়, তাহা ছোঁয়াইয়া দোলকের সোলাকে বিদ্যুৎযুক্ত কর। সুতরাং সোলায় ধন-বিদ্যুৎ রহিল। এখন ঐ রবারকে সোলার কাছে আনো। এই অবস্থায় যদি দুইয়ের মধ্যে আকর্ষণ দেখা যায়, তবে রবারে ঋণ-বিদ্যুৎ আছে ঠিক হয় এবং বিকর্ষণ দেখা গেলে ধন-বিদ্যুৎ আছে বুঝা যায়। তোমরা একে একে কাচে ফ্লানেল্ রবার গন্ধক এবং গাটাপার্চা ঘষিয়া তাহাতে কোন্ বিদ্যুৎ জন্মিল, দোলকের সাহায্যে ঠিক্ করিয়ো। দেখিবে, ইহাতে কাচে কখনো ধন-বিদ্যুৎ এবং কখনো বা ঋণ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং যে-জিনিষ

দিয়া ঘষা যায়, তাহার উপরে উৎপন্ন বিদ্যুতের জাতি নির্ভর করে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে-সকল পরীক্ষা করিলাম, তাহা হইতে যাহা জানা গেল, তোমাদিগকে আবার সেগুলি বলিতেছি।

১। একই প্রকারের বিদ্যুতে পূর্ণ দুইটি জিনিষে বিকর্ষণ দেখা যায়। অর্থাৎ তাহারা পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে।

২। বিপরীত বিদ্যুতে পূর্ণ দুইটি জিনিষ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

কি-রকম বলে এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলে, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে,—

১। দুইটি বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষের মধ্যেকার দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করা যায় তবে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ বা বিকর্ষণের পরিমাণে $\frac{১}{৪}$ হয় এবং দূরত্বকে তিনগুণ বাড়াইলে তাহা $\frac{১}{৯}$ হইয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি। আবার দূরত্বকে যখন অর্দ্ধেক করা যায়, তখন আকর্ষণ-বিকর্ষণ চারিগুণ হয় এবং দূরত্বকে $\frac{১}{৩}$ করিলে উহাই ৯ গুণ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ দুইটি বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষের

আকর্ষণ-বিকর্ষণকে দূরত্বের বর্গের বিলোম-অনুপাতে (Inversely) বাড়ে-কমে।

২। আবার দুই জিনিষের বিদ্যুতের পরিমাণ যদি পৃথক্ থাকে, তবে তাহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণ দুইয়ের বিদ্যুৎ-পরিমাণের গুণফল অনুসারে বাড়ে-কমে।

বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসে ?

গালায় ফ্লানেল্ ঘষিলে বিদ্যুৎ হয়, আবার রবারে বা গন্ধকে রেশম ঘষিলেও বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই-রকম অনেক পরীক্ষায় তোমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছ। কিন্তু বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসে তোমরা বলিতে পারো কি ? প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তোমাদিগকে এখানে তাহার একটু আভাষ দিব।

এখানকার ছবিতে যে-দুখানি চাক্তি দেখা যাইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কাচের হাতল লাগানো আছে। ডাইনের চাক্তিখানি কাচের এবং বাঁয়ের চাক্তিখানি কাঠের। কাঠের চাক্তিটি আবার রেশমী কাপড় দিয়া মোড়া আছে। এখন এই দুই চাক্তিকে ঘষিলে
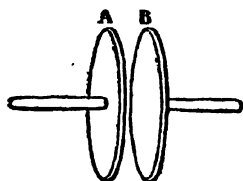
কাঠের ও কাচের চাক্তি

কি হয়, বোধ করি তোমরা নিজে-নিজেই বুঝিতে পারিবে। রেশমের ঘষা পাইয়া কাচে ধন-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু রেশম-মোড়া

কাঠের চাক্‌তি বাদ পড়িবে না। ইহাকে যদি তোমরা বৈদ্যুত-দোলকের সাহায্যে পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহাতেও বিদ্যুৎ আছে। কিন্তু এই বিদ্যুৎকে কাচের বিদ্যুতের মত ধন-জাতীয় দেখিতে পাইবে না। ইহা হইয়া দাঁড়াইবে ঋণ-বিদ্যুৎ। তাহা হইলে দেখা গেল, কাচ ও রেশম ঘষায় কাচে ধন এবং রেশমে ঋণ-বিদ্যুৎ জন্মিল। কেবল কাচ এবং রেশমেই যে এই ব্যাপার দেখা যায়, তাহা নহে। যে-কোনো দুইটি জিনিষ ঘষিলে, একটাতে থাকে ধন এবং অন্যটাতে থাকে ঋণ-বিদ্যুৎ। রবার গালা গন্ধক প্রভৃতি জিনিষে রেশম, পশম, বিড়ালের চামড়া, ছাগলের চামড়া প্রভৃতিকে একে একে ঘষিলে একটাতে ধন-বিদ্যুৎ এবং অপরটায় ঋণ-বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইবে। মনে রাখিয়ো, দুইটা জিনিষ পৃথক্ হওয়া দরকার। কাচে কাচে বা গালায় গালায় ঘষিলে বিদ্যুৎ জন্মায় না।

এই রকম অনেক পরীক্ষা দেখিয়া এক দল পণ্ডিত মনে করেন, পৃথিবীর সব জিনিষেই সমান সমান পরিমাণে ধন ও ঋণ বিদ্যুৎ আছে। ধন-বিদ্যুৎ ঋণ-বিদ্যুৎকে টানিয়া আট্‌কাইয়া রাখে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো জিনিষে বিদ্যুতের লক্ষণ দেখা যায় না।

তার পরে ঘষাঘষিতে বা অন্য কোনো কারণে যখন সেই ধন ও ঋণ বিদ্যুৎ তফাৎ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় পাওয়া যায়। আগের পরীক্ষায় কাচের চাক্তির সঙ্গে কাঠের চাক্তির রেশমকে ঘষা গেল, তখন দুইয়েরই ধন ও ঋণ বিদ্যুৎ তফাৎ হইয়া ধন-বিদ্যুৎ কাচে এবং ঋণ-বিদ্যুৎ রেশমে আশ্রয় লইয়াছিল।

বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই সকল কথা আজ-কালকার পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। পদার্থের পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ জন্মে, ইহা তাঁহারা নানা আশ্চর্য্য পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরে বলিব।

পরিচালক ও অপরিচালক দ্রব্য

প্রায় দুই শত বৎসর আগে গ্রে (Stephen Gray) নামে একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কাচ বা গালার এক অংশকে ঘষিয়া যখন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তখন তাহা সেই ঘষা-অংশেই স্থির হইয়া থাকে; অন্য অংশে বিদ্যুতের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। একখণ্ড লম্বা গালার একদিকে পশম ঘষিয়া বৈদ্যুত-দোলক দিয়া তোমরা ইহার পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, গালার ঘষা দিকটাই কেবল দোলকের সোলাকে টানিতেছে। অন্য দিক্‌টা সোলাকে টানিবে না,—সেখানে বিদ্যুৎ নাই। কাচ গন্ধক রবার গাটাপার্চা প্রভৃতির এক অংশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও একই ফল দেখা যাইবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া গ্রে সাহেব ঠিক্ করিয়াছিলেন, কাচ গন্ধক রবার প্রভৃতি জিনিষ বিদ্যুতের অপরিচালক। অর্থাৎ এই সকল জিনিষের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলাফেরা করিতে পারে না। কিন্তু জল বা ধাতু প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহারি

ঠিক্ উল্টা ব্যাপার দেখা যায়। ইহাদের কোনো অংশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিলে, তখনি তাহা সর্ব্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রে সাহেব এই সব জিনিষের নাম দিয়াছিলেন, পরিচালক (Conductor)। এই রকম পরীক্ষা করিয়া কোন্ কোন্ জিনিষ বিদ্যুতের পরিচালক এবং কোন্‌গুলিই বা অপরিচালক তাহা আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। জীব-দেহ এবং ধাতু-মাত্রেই পরিচালক। ইহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ অবাধে চলা-ফেরা করে। কাচ, কাগজ, রজন, গন্ধক, রেশম, পশম প্রভৃতি পরিচালক। উহারা বিদ্যুৎকে পলাইতে না দিয়া আট্‌কাইয়া রাখে। কিন্তু মনে রাখিয়ো, সম্পূর্ণ পরিচালক এবং সম্পূর্ণ অপরিচালক জিনিষ পৃথিবীতে নাই। রেশম এত অপরিচালক, তবুও তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ অল্প পরিমাণে চলা-ফেরা করে। তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতু খুব পরিচালক, তথাপি এগুলির ভিতর দিয়া চলিবার সময়ে বিদ্যুৎ একটু-আধটু বাধা পায়।

মানুষের দেহ পরিচালক এবং মাটিও পরিচালক। কোনো ধাতুর জিনিষকে বিদ্যুৎপূর্ণ করিয়া হাত দিয়া ধরিলে, তাহার সমস্ত বিদ্যুৎ আমাদের শরীরের ভিতর

দিয়া চলিয়া মাটিতে যায়। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটা পরিচালক,—তাই মাটিতে প্রবেশ করিলে আর বিদ্যুতের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং, ধাতু বা অন্য অন্য পরিচালক জিনিষকে বিদ্যুতে ভর্ত্তি করিতে গেলে, তাহাকে হাতে ধরিয়া রাখিলে চলিবে না; কোনো অপরিচালক জিনিষের সাহায্যে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বৈদ্যুত-দোলকে কেন কাচের ডাণ্ডা থাকে এবং সোলাকে কেন রেশমী সূতায় ঝুলাইতে হয়, বোধ করি তোমরা এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। সোলা পরিচালক কিন্তু কাচ ও রেশম অপরিচালক। তাই সোলার বিদ্যুৎ যাহাতে পলাইয়া না যায়, তাহারি জন্য সোলাকে রেশমী সূতায় বাঁধিয়া কাচের ডাণ্ডায় ঝুলানো হয়। কোনো বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষকে টেবিলের উপরেও রাখা চলে না। কারণ কাঠ পরিচালক। তবে যে-টেবিলের পায়াগুলি কাচের, তাহাতে রাখিলে কাঠ দিয়া বিদ্যুৎ মাটিতে যাইতে পারে না,—পায়ার কাচ বিদ্যুৎ-পথে বাধা দেয়। আবার কাচ যদি ভিজা থাকে, বা তক্তার গায়ে ময়লা জমিয়া থাকে, তবে সে-কাচ পরিচালক হইয়া দাঁড়ায়। জল ও ময়লা পরিচালক। বাতাস এবং বাষ্পমাত্রেই অপরিচালক।

কিন্তু জলীয় বাষ্প কাচের গায়ে জমা হইয়া যখন জল-বিন্দু হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা বিদ্যুৎকে পরিচালন করে। এই-সব কারণে কোনো ধাতুর জিনিষে বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিতে গেলে কাচের বা গালার খুঁটির উপরে তাহাকে রাখিতে হয়। কিন্তু কাচ গালা রবার প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ রাখিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইবার প্রয়োজন হয় না। এগুলি বিদ্যুতের অপরিচালক,—কাজেই, এগুলিতে যেখানকার বিদ্যুৎ সেখানেই থাকে ; পলাইতে পারে না।

টেলিগ্রাফ্ টেলিফোনের তার তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। এগুলি তামা বা ব্রোঞ্জ দিয়া তৈয়ারী। ব্রোঞ্জ পিতলের মতো এক-রকম মিশ্র ধাতু। ধাতু-মাত্রেই বিদ্যুতের পরিচালক। আবার অল্প দামের ধাতুর মধ্যে তামা দিয়াই বিদ্যুৎ সহজে চলা-ফেরা করে। তাই বিদ্যুৎ চালাইবার জন্য টেলিগ্রাফের তার প্রায়ই তামা দিয়া তৈয়ারি করা হয়। যদি পাটের দড়ি দিয়া এক ষ্টেশনকে অন্য ষ্টেশনের সঙ্গে যোগ করা থাকিত, তাহা হইলে দড়ি দিয়া বিদ্যুৎ চলিত না। পাটের দড়ি অপরিচালক।

রেল-রাস্তার পাশে লোহার থামের উপরে

টেলিগ্রাফের তার কি-রকমে লাগানো থাকে তোমরা বোধ করি ভালো করিয়া দেখ নাই। এইবার যখন রেলের ধারে বেড়াইতে যাইবে, তখন দেখিয়ো, প্রত্যেক থামের উপরে এক-একটা চীনা মাটির ছোটো পেয়ালা লাগানো আছে এবং টেলিগ্রাফের তার সেই পেয়ালার সঙ্গে আঁটা রহিয়াছে। তার লাগাইবার জন্য কেন এত হাঙ্গামা করা হয়, তোমরা তাহা এখন বুঝিতে পারিবে। লোহা বা কাঠের খুঁটিগুলি পরিচালক এবং চীনা মাটি অপরিচালক। চীনা মাটির উপরে লাগানো থাকে বলিয়া তারের বিদ্যুৎ খুঁটি বহিয়া মাটিতে পলাইতে পারে না। তোমাদের কাহারো কাহারো বাড়ীতে হয় ত বিদ্যুতের আলো আছে। বিদ্যুৎ তামার তার দিয়া বাতির ভিতরে গেলে বাতি জ্বলিয়া আলো দেয়। তাই ঘরে ঘরে তার লাগানো থাকে। এই তারগুলি কি-রকম, লক্ষ্য করিয়াছ কি ? এগুলির উপরে প্রথমে রবারের খুব পাতলা প্রলেপ থাকে; তাহার উপরে সূতা জড়াইয়া প্যারাফিন্ মাখানো হয়। রবার ও প্যারাফিন্ দুই-ই অপরিচালক জিনিষ। তাই তারের ভিতর দিয়া যে-বিদ্যুৎ চলে, তাহা কোনো জিনিষে ঠেকিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। গাছের ডালপালা টেলিগ্রাফের

তারে ঠেকিলে রেলের লোকেরা তাড়াতাড়ি সেগুলিকে কাটিয়া ফেলে। কেন ইহা করে, তোমরা বোধ করি এখন বুঝিতে পারিয়াছ। গাছের তাজা ডালপালা ও পাতা বিদ্যুতের পরিচালক। তাই এগুলি তারে ঠেকিলে বিদ্যুৎ ডালপালা দিয়া মাটিতে নামিয়া পড়ে; তাহা তার দিয়া আর দূরে যাইতে পারে না। কাজেই, টেলিগ্রাফের খবর যাওয়া বন্ধ হয়।

টেলিগ্রাফের খাম্বার গায়ে কি-রকমে তার লাগানো থাকে, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবির সাদা অংশ A চীনা-মাটির তৈয়ারী। দেখ, স্ক্রুপ্ দিয়া একটা চীনা-মাটির প্লেটকে খাম্বার গায়ে আঁটা হইয়াছে। তার পরে আছে চীনা-মাটির পেয়ালা। ইহার মাঝে একটা শিক্ লাগানো আছে। টেলিগ্রাফের তার সেই শিকের উপরেই রহিয়াছে। পেয়ালাটিকে কেন উপুড় করিয়া লাগানো
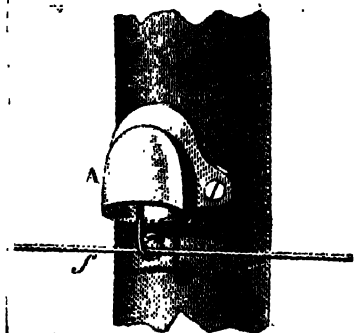
টেলিগ্রাফের তার

হইয়াছে, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। সোজা করিয়া লাগাইলে বৃষ্টির জল এবং আরো কত ছাই-মাটি তাহার খোলে আসিয়া জমা হয়, ইহাতে তারের বিদ্যুৎ সেই সব ময়লা-মাটি দিয়া বাহিরে পলায়। তাই পেয়ালাটিকে উপুড় করিয়া লাগানো হয়। ইহাতে বৃষ্টির জল বা কোনো-রকম ময়লা পেয়ালায় জমিতে পায় না।

বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্র

কোনো জিনিষে বিদ্যুৎ আছে কিনা জানিতে হইলে বৈদ্যুত-দোলক ব্যবহার করিতে হয়। তোমরা অনেক পরীক্ষায় তাহা দেখিয়াছ। কিন্তু সকল সময়ে বৈদ্যুত-দোলক ব্যবহার করা যায় না। তা'ছাড়া কোনো জিনিষে যখন বিদ্যুতের পরিমাণ খুব কম থাকে, তখন এই যন্ত্রে বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া কঠিন হয়। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিদ্যুৎ-দর্শক (Electroscope) নামে একটি সুন্দর যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। কোনো জিনিষে নিতান্ত কম বিদ্যুৎ থাকিলেও এই যন্ত্রে তাহা ধরা যায়।

বিদ্যুৎ-দর্শক

উপরে বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্রের একটা ছবি দিলাম। তোমরা ছবি দেখিয়া হয় ত ভাবিতেছ, যন্ত্রটি না-জানি কত জটিল। কিন্তু মোটেই জটিল নয়। চেষ্টা করিলে তোমরা নিজে-নিজেই এই রকম যন্ত্র তৈয়ারি করিতে পারিবে। ছবিতে দেখ, কুইনিনের শিশির মতো একটা

বড়-মুখওয়ালা শিশি রহিয়াছে। ইহার মুখ কর্কের ছিপিতে আট্‌কাইয়া তাহার ভিতর দিয়া একটা পিতলের ডাণ্ডা প্রবেশ করানো হইয়াছে। ডাণ্ডার উপরে B-চিহ্নিত পিতলের বল লাগানো আছে। ইহার নীচের প্রান্তে যে-দুইটি লম্বা জিনিষ দেখা যাইতেছে, তাহা সোনার পাত। সোনার পাতের কথা শুনিয়া তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এত দামী জিনিষ কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু সোনার পাতের দাম বেশী নয়। পূজার সময়ে প্রতিমার গায়ের মাটির অলঙ্কার সোনার পাত দিয়া মোড়া হয়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? বাজারে দুই-আনা চারি-আনায় অনেকগুলি সোনার পাত পাওয়া যায়। সোনার পাত ডাণ্ডায় লাগানো কঠিন। ইহা এত হাল্কা যে, সামান্য বাতাসে বা নিশ্বাসের হাওয়ায় উড়িয়া যায়। তাই সোনার বদলে ডচ্ মেটাল নামে একরকম মিশ্রধাতুর পাত বিদ্যুৎ-দর্শকে লাগানো হইতেছে। কাচ অপরিচালক, কিন্তু কাচের গায়ে চারিদিকের বাতাস হইতে যে-জলীয় বাষ্প জমাট্ বাঁধে, তাহা বিদ্যুতের পরিচালক। তাই শিশির ছিপি, মুখ এবং গলার নীচে খানিকটা গালার বার্ণিশ্ লাগানো থাকে। গালা অপরিচালক; তাই গালার বার্ণিশও

অপরিচালক। দেখ, যন্ত্রটি কত সহজে তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আমরা কুইনিনের শিশি লইয়া এই রকমে অনেক বিদ্যুৎ-দর্শক তৈয়ারি করিয়াছি। এখন মনে করা যাউক, কোনো বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষ দিয়া যন্ত্রের "B" অংশকে ছোঁয়া গেল। কি হইবে বলা যায় না কি? ইহাতে ধাতুর ডাণ্ডা ও সোনার পাত বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়িবে,—ধাতুমাত্রেই বিদ্যুতের পরিচালক। কিন্তু তোমরা জানো, দুই কাছাকাছি জিনিষে যখন একই জাতীয় বিদ্যুৎ থাকে, তখন তাহারা পরস্পর তফাতে যাইবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা দেয়। কাজেই, সোনার যে পাত দুখানি আগে গায়ে-গায়ে লাগিয়াছিল, বিদ্যুৎ-যুক্ত হওয়ায় এখন তাহারা পরস্পর তফাতে যাইবার জন্য ফাঁক হইয়া দাঁড়াইবে। এই রকমে পাত দুটির ফাঁক দেখিয়া অতি অল্প বিদ্যুৎও যন্ত্রে ধরা পড়ে। গালা বা কাচে রেশম ঘষিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ আছে কি না তোমরা এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়ো। বিদ্যুৎ না থাকিলে সোনার পাতের কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না; অতি-সামান্য বিদ্যুৎ থাকিলেও পাত দু'টি ফাঁক হইয়া দাঁড়াইবে।

নিজের হাতে বিদ্যুৎ-দর্শক তৈয়ারী করিয়া কি-রকমে পরীক্ষা করিতে হয় বলিলাম। বড় বড়
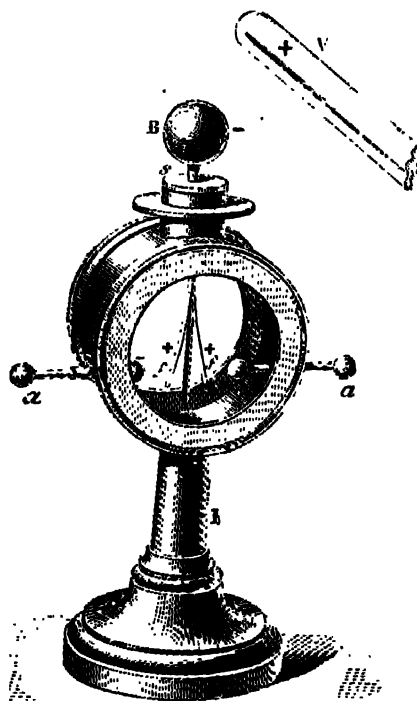
বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্র

পরীক্ষাগারে কিন্তু এ-রকম ছোটো যন্ত্রে কাজ চলে না।

তাই সেখানে বেশ ভালো এবং বড় বিদ্যুৎ-দর্শক রাখিতে হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একটি বড় যন্ত্রের ছবি দিলাম। ইহাতে তোমাদের ছোটো যন্ত্রের সকল অংশই আছে। ff-চিহ্নিত সোনার পাত দুইটি একই বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পরস্পর কত তফাতে গিয়াছে, ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষ

তোমরা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে দেখিয়াছ, চুম্বকের শক্তি তাহার প্রত্যেক অণুর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ চুম্বকের ভিতর-বাহির সকলি চুম্বক। কিন্তু বিদ্যুতে তাহা দেখা য়ায় না। কোনো পরিচালক জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে, সেই বিদ্যুৎ জিনিষটির কেবল উপরেই থাকে,—ভিতরে তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না। কেবল ইহাই নয়, ঐ বিদ্যুৎ পরিচালক জিনিষের উপরে থাকিয়া দূরে যাইবার জন্যও চেষ্টা করে।

এখানে একটি ছবি দিলাম। ছবির "A"-চিহ্নিত অংশটি ছোট পিতলের গোলা। ইহা রেশমের সূতা
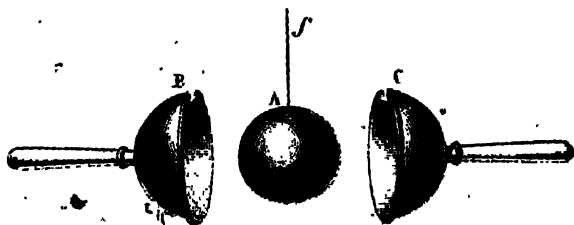
"*f*"-এ বাঁধা থাকিয়া ঝুলিতেছে। কাজেই ইহাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে সে-বিদ্যুৎ পলাইতে পারে না। "B" এবং "C" কাচের হাতল্-ওয়ালা দুইটি ধাতু-নির্ম্মিত

ঢাক্‌নি। হাতলে ধরিয়া ঢাক্‌নি চাপা দিলে গোলাটি ঢাক্‌নির গায়ে ঠিক্ লাগিয়া যায়। এখন গোলাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত কর এবং তার পরে সেটিকে ঐ ঢাক্‌নি দিয়া চাপা দাও। দেখিবে, এই অবস্থায় গোলায় একটুও বিদ্যুৎ থাকিবে না,—তাহার সমস্ত বিদ্যুৎ ঢাক্‌নি দুটিতে আসিয়া জমিবে। কেন এমনটি হয়, বলা কঠিন নয়। গোলার বিদ্যুৎ তাহার গায়ের উপরেই ছড়াইয়া ছিল। তার পরে যেই সেটি ঢাক্‌নি-চাপা পড়িল, অমনি গায়ের সমস্ত বিদ্যুৎ ঢাক্‌নিতে আসিয়া হাজির হইল।

তাহা হইলে এই পরীক্ষা হইতে জানা গেল, কোনো জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে সমস্ত বিদ্যুৎই তাহার গায়ের উপরে ছড়াইয়া থাকে,—গায়ের ভিতরে প্রবেশ করে না।

ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের নাম তোমরা আগে শুনিয়াছ। বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষের যে কেবল গায়েই বিদ্যুৎ থাকে, তাহা লইয়া তিনি একটি মজার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যাহাতে দুইটা লোক বেশ আরামে বসিতে পারে, ফ্যারাডে সাহেব সেই রকম একটা ছোটো ঘর টিন দিয়া তৈয়ারি করিয়াছিলেন।

ঘরের তলাটা ছিল, পুরু রবারের চাদর দিয়া তৈয়ারি। তার পরে বড় কল দিয়া ঘরের টিনের দেওয়াল ও ছাদ বিদ্যুৎ-যুক্ত করা হইয়াছিল। তলায় অপরিচালক রবার ছিল, কাজেই, বিদ্যুৎ ঘর ছাড়িয়া মাটিতে যাইতে পারে নাই। তোমরা বোধ করি ভাবিতেছ, ঘরের দেওয়ালে ও ছাদে যখন এত বিদ্যুৎ, তাহার ভিতরে গেলেই বুঝি মানুষ মরিয়া যাইবে। কিন্তু কেহ মারা যায় নাই। ফ্যারাডে নিজে সেই ঘরে বসিয়া বই পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেওয়াল ও ছাদের বিদ্যুৎ কেন তাঁহার শরীরে লাগিল না, বোধ করি তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। ফাঁপা বা নিরেট যে-কোনো জিনিষে বিদ্যুৎ দিলে তাহা ভিতরে না গিয়া কেবল তাহার বাহিরের গায়ে ছড়াইয়া থাকে। তাই ফ্যারাডে যে-ঘর তৈয়ারি করিয়াছিলেন, তাহার দেওয়ালের ও ছাদের বাহিরের গায়ে বিদ্যুৎ ছিল,—কাজেই, তাহা ফ্যারাডের গায়ে লাগে নাই।

ফ্যারাডে এই রকমে যে-পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা লইয়া আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা একটা মজার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। বড় বড় পরীক্ষাগারে অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকে। এই-সব যন্ত্রে যদি কোনো

রকমে একটু-আধটু বিদ্যুৎ লাগে, তাহা হইলে সেগুলি খারাপ হইয়া যায়। কাজেই এই সকল যন্ত্রকে অতি সাবধানে রাখা দরকার। তাই বৈজ্ঞানিকেরা বৈদ্যুত খাঁচা (Electric cage) নামে এক রকম যন্ত্র তৈয়ারি করিয়াছেন। এই খাঁচার ভিতরে রাখিলে সূক্ষ্ম
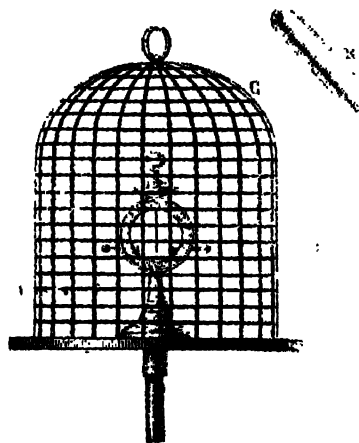
বৈদ্যুত খাঁচা

যন্ত্রগুলি নিরাপদ থাকে। এখানে খাঁচার একটা ছবি দিলাম। দেখ, ইহার ভিতরে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র রহিয়াছে। খাঁচার নির্ম্মাণে বিশেষ কারিগরি নাই। কেবল ধাতুর জাল দিয়া ইহা তৈয়ারি। দুধ বা

খাবার রাখার জন্য যেমন লোকের বাড়ীতে ঢাকা থাকে, ইহা সেই রকমেই একটা ঢাকা মাত্র। কোনো কারণে পরীক্ষাগারের বিদ্যুৎ গায়ে ঠেকিলে তাহা খাঁচার উপরেই থাকিয়া যায়; ভিতরের যন্ত্রকে ছুঁইতে পারে না। কাজেই, উহার ভিতরকার যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ হইতে রক্ষা পায়। আকাশের বিদ্যুৎ মাটিতে নামিয়া আসাকেই আমরা বাজ-পড়া বলি। বাজ পড়িলে কি হয় তোমরা তাহা জানো। কাছে মানুষ-গরু যাহা থাকে মরিয়া যায়। কেবল ইহাই নয়; ঘরে পড়িলে তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়; পাকা বাড়ী পর্য্যন্ত ভাঙিয়া চূরমার হয়। যাহাতে বিদ্যুতে ঘর-বাড়ীর ক্ষতি করিতে না পারে, তাহার জন্য কখনো কখনো সমস্ত বাড়ীটাকে তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়। যদি বাজ পড়ে, এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ জালের বাহিরের গায়ে থাকিয়া যায়। এ-সম্বন্ধে আরো অনেক কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

কোনো জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে বিদ্যুৎ সেই জিনিষের যে কেবল বাহিরের গায়েই আবদ্ধ থাকে, নানা পরীক্ষায় তোমরা তাহা দেখিলে। এখানে আর একটি পরীক্ষার কথা বলিব। ইহা হইতে তোমরা বিদ্যুৎ-

সম্বন্ধে আর একটি নূতন খবর পাইবে। দেখ, এখানকার ছবিতে একটা কিম্ভূত-কিমাকার জিনিষ আঁকা রহিয়াছে। জিনিষটাকে পিতল বা অন্য কোনো ধাতুতে তৈয়ারি করিয়া একটা কাচের খুঁটির উপরে বসানো হইয়াছে। এখন মনে কর, ইহাকে যেন

বিদ্যুতের গাঢ়তা

বিদ্যুৎ-যুক্ত করা হইয়াছে। তলায় কাচের খুঁটি রহিয়াছে। কাজেই, বিদ্যুৎ পলাইবার পথ না পাইয়া জিনিষটার বাহিরের গায়ে আট্‌কাইয়া থাকিবে। এখন উহার কাছে বৈদ্যুত-দোলক আনিয়া যদি পরীক্ষা করিতে পারো, তবে দেখিবে, ইহার দুই সরু দিকে দোলকের সোলায় যত টান পড়িবে, মাঝে তত টান

পড়িবে না। সুতরাং বলিতে হয়, ইহার দুই সরু দিকে যত বিদ্যুৎ আছে, মাঝের মোটা অংশে তত নাই। এই পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোনো জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে তাহার গায়ের উপরকার বিদ্যুতের পরিমাণ সব জায়গায় সমান থাকে না। তাহার যে জায়গাটা ছুঁচলো সেখানেই বেশি থাকে, এবং যাহা নীচু বা গভীর, সেখানে খুব অল্প পরিমাণে থাকে। কিন্তু একটা পিতলের গোলককে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে বিদ্যুৎ সব জায়গায় সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। কারণ, উহার কুব্জতা সব জায়গাতেই সমান। কিন্তু তাহারি পিঠ্ যদি উঁচু-নীচু থাকে, তবে বিদ্যুৎ নীচু জায়গা ছাড়িয়া উঁচু জায়গায় আশ্রয় লয়। বিদ্যুতের এই স্বভাবটা জলের স্বভাবের ঠিক্ উল্টা। জল উঁচু জায়গা ছাড়িয়া নীচু জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বিদ্যুৎ নীচু জায়গা ছাড়িয়া উঁচু জায়গায় জমা হয়।

তাহা হইলে দেখ, কোনো জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে আকৃতি-অনুসারে তাহার কোনো কোনো জায়গায় বেশি বিদ্যুৎ জমা হয়। কেবল ইহাই নয়, কোনো জায়গার বিদ্যুতের গাঢ়তা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাকে ছাড়াইলেই, তাহা আর সেখানে আট্‌কাইয়া

থাকিতে চায় না। তখন স্ফুলিঙ্গের আকারে লাফাইয়া তাহা পাশের অন্য জিনিষের গায়ে চলিয়া যায়,—মাঝের বাতাস তাহাকে বাধা দিতে পারে না। কাছে কোনো জিনিষ না থাকিলেও বিদ্যুৎকে আপনিই চলিয়া যাইতে দেখা যায়। কোনো পরিচালক জিনিষের গায়ে ধাতু-নির্ম্মিত ছুঁচলো কাঁটা লাগাইয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে, জিনিষটাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলেই কাঁটার ছুঁচ্‌লো মুখ দিয়া বিদ্যুৎ পলাইয়া যাইতেছে। অন্ধকার ঘরে পরীক্ষা করিলে কাঁটার মুখে ঝাঁটার আকারে বিদ্যুতের আলোও দেখা যায়। কোনো পরিচালক দ্রব্য ছাড়িয়া বিদ্যুতের পলাইয়া যাইবার এই রকম চেষ্টাকে বলা হয় বৈদ্যুতিক চাপ (**Electric pressure or tension**)।

পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রন্‌

তোমরা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে দেখিয়াছ, চুম্বকের শক্তি তাহার অণুতেই থাকে এবং সেই শক্তিতে চুম্বকে নানা গুণ প্রকাশ পায়। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বিদ্যুৎ-সম্বন্ধেও সেই রকম কথা বলিতেছেন। ইহা বুঝিতে হইলে জড় দ্রব্যের গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা কি বলেন, তোমাদের আগে তাহা জানা দরকার।

আগেই বলিয়াছি, আমরা চারিদিকে যে-সব জিনিষ দেখিতে পাই, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন অণু দিয়া তৈয়ারি। অসংখ্য খড়ি মাটির অণু লইয়া এই খড়ির টুক্‌রা তৈয়ারি হইয়াছে। সেই-রকম কোটি কোটি লোহার অণু দিয়া লোহা, জলের অণু দিয়া জল এবং লবণের অণু দিয়া লবণ তৈয়ারি হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া এবং অনেক মাপ-জোঁক্‌ ও হিসাবপত্র করিয়া কতখানি জিনিষে কতগুলি অণু আছে, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পঁচিশ লক্ষ অণুকে একের পর একটা রাখিয়া

মালার মতো সাজাইলে তাহার দৈর্ঘ্য হয়, এক মিলিমিটার। এক মিলিমিটার কতটা লম্বা বোধ করি তোমরা জানো না। "o" এই ইংরাজি অক্ষরটার ভিতরকার ফাঁক যতটা তাহা এক মিলিমিটারের সমান। এই ফাঁকে যে-জিনিষের পঁচিশ লক্ষটা সারে সারে দাঁড়াইতে পারে তাহা কত ছোটো, এখন বোধ হয় তোমরা অনুমান করিতে পারিবে। ইহা কাল্পনিক কথা নয়; গণিতের সাহায্যে হিসাব-পত্র করিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং, ইহাতে অবিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা যে অতি-ক্ষুদ্র জিনিষকে অণু বলিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটি দুই হইতে আরম্ভ করিয়া আরো অনেক ছোটো জিনিষ দিয়া তৈয়ারি। এই ছোটো জিনিষের নাম পরমাণু (Atom)। জলের যে-অসংখ্য অণু দিয়া একটি শিশিরের বিন্দু তৈয়ারি হয়, তাহার প্রত্যেক অণুতে তিনটি করিয়া পরমাণু আছে,—দুইটি আছে হাইড্রোজেনের, এবং বাকি একটা আছে অক্সিজেনের পরমাণু। এই তিনটিতে মিলিয়াই জলের এক-একটা পরমাণু হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন তরকারির সঙ্গে যে-লবণ খাই তাহার এক-একটা অণু

কতগুলি পরমাণু দিয়া প্রস্তুত, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। লবণের প্রত্যেক অণুতে থাকে দুইটা করিয়া পরমাণু,—একটা সোডিয়ম্ ধাতুর, আর একটা ক্লোরিন্ নামক গ্যাসের। তুঁতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহার প্রত্যেক অণুতে ছয়টা করিয়া পরমাণু থাকে। একটা তামার, একটা গন্ধকের এবং বাকি চারিটা অক্সিজেনের। চিনি, তেল, চর্ব্বি প্রভৃতি যে-সব জিনিষ গাছ-পালা ও প্রাণীর শরীর হইতে জন্মে, সেগুলির অণুতে পরমাণুর সংখ্যা আরো বেশী থাকে। অণু এত ছোটো জিনিষ যে, সেগুলিকে চোখে দেখা যায় না, এমন-কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও সন্ধান মিলে না। ভাবিয়া দেখ, যে-সব পরমাণু দিয়া অণু নির্ম্মিত, সেগুলি আরো কত ছোটো। হিসাব করিলে দেখা যায়, হাইড্রোজেনের পরমাণুকে পর-পর সাজাইয়া এক ইঞ্চি লম্বা করিতে হইলে সাড়ে সাতাশ কোটী পরমাণুর দরকার হয়।

তাহা হইলে দেখ, পরমাণু যে কত ছোটো জিনিষ তাহা কল্পনা করাই দায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর কেবল আয়তন আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রত্যেক জিনিষের অণুর এবং তাহার পরমাণুর ওজন

পর্য্যন্ত তাঁহারা ঠিক্ রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত মূল পদার্থ আবিষ্কার করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে হাইড্রোজেন নামক বাষ্পই সব চেয়ে হাল্কা। তাই বৈজ্ঞানিকেরা হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের সঙ্গে অন্য মূল জিনিষের পরমাণুর ওজন তুলনা করিয়া থাকেন। এই হিসাবে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন যদি ১ ধরা যায়, তবে অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন হইয়া দাঁড়ায় ১৬। অর্থাৎ অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন, হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের ১৬ গুণ। সেই রকমে লোহার পরমাণুর ওজন ৫৬, সোনার ১৯৭, পারার ২০০, জানা গিয়াছে। কোন্ জিনিষের পরমাণুর ওজন সব চেয়ে বেশী, বোধ করি তোমরা জানো না। ইউরেনিয়ম্ (Uranium) নামে যে এক রকম ধাতু আছে, তাহার পরমাণুর ওজন ২৩৮,—অর্থাৎ ইহার এক-একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের পরমাণুর চেয়ে ২৩৮ গুণ ভারি।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এখানেই শেষ,—পরমাণুর চেয়ে বুঝি আর ছোটো জিনিষ ব্রহ্মাণ্ডে নাই। কিন্তু তাহা নয়। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরমাণু লইয়া পরীক্ষা

করিয়া আরো যে-সব ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। ইঁহারা দেখিয়াছেন, আমরা যাহাকে পরমাণু বলি, তাহার ভিতরে একটা, দুইটা, পাঁচটা, দশটা বা তাহারো বেশি অতি-ছোটো জিনিষ আছে। এগুলি কিন্তু ইট, কাঠ, পাথর বা লোহার মতো জিনিষ নয়। এক-এক কণা ঋণ-বিদ্যুৎই তাহাদের সর্ব্বস্ব। এগুলির ভার নাই বলিলেই চলে। সূক্ষ্ম হিসাবে ইহাদের ভার হাইড্রোজেন পরমাণুর ভারের $\frac{১}{১৮৫০}$ ভাগের সমান। বাক্সের ভিতরে যেমন টাকা পয়সা থাকে, ফলের ভিতরে যেমন বীজ থাকে, তোমরা হয়-ত ভাবিতেছ, এই বিদ্যুৎ কণাগুলি সেই রকমেই পরমাণুর পেটের ভিতরে থাকে। কিন্তু তাহা নয়। এগুলি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকে না। প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরে এক-এক কণা ধন-বিদ্যুৎ থাকে। পরমাণুর যে-ভার দেখা যায় তাহা এই ধন-বিদ্যুৎ হইতেই জন্মে। তাহারি চারিদিকে ঐ ঋণ-বিদ্যুতের কণাগুলি সর্ব্বদাই ঘুরপাক্ খায়। এক-একটা পরমাণু যেন এক-একটা সৌরজগৎ! সূর্য্যের চারিদিকে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ যেমন রাত্রিদিন ঘুরপাক্ খায়, তেমনি

পরমাণুর ভিতকার ধন-বিদ্যুৎকে ঋণ-বিদ্যুতের কণা অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়। আশ্চর্য্য নয় কি? কিন্তু ইহা শুনিয়া তোমরা মনে করিয়ো না, গ্রহেরা যেমন নির্দ্দিষ্ট পথে এবং নির্দ্দিষ্ট বেগে চলাফেরা করে, ঋণ-বিদ্যুতের কণা তাহাই করে। তুলনা করিবার জন্যই পরমাণুকে সৌরজগতের মতো বলিলাম। এই ব্যাপার লইয়া পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করিতেছেন। শেষে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াইবে বলা যায় না। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর ভিতরকার ঋণ-বিদ্যুতের কণাগুলির নাম দিয়াছেন ইলেক্‌ট্রন্ (Electron) এবং মাঝে যে-কণাপ্রমাণ ধন-বিদ্যুৎ থাকে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে কেন্দ্র (nucleus)। কিন্তু কেবল ধন-বিদ্যুৎ লইয়াই কেন্দ্র নয়। ধন-বিদ্যুতের সঙ্গে কেন্দ্রে ইলেক্‌ট্রনও থাকে। সুতরাং ধন-বিদ্যুৎ (Proton) এবং ঋণ-বিদ্যুৎযুক্ত ইলেক্‌ট্রন্‌কেই কেন্দ্র বলিতে হয়। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্য-আকাশ এবং বহিরাকাশ দুই জায়গাতেই ইলেক্‌ট্রন্ থাকে। মধ্যাকাশের ইলেক্‌ট্রন্ সেখানকার ধন-বিদ্যুৎকে সাম্যাবস্থায় রাখিতে চায়। কিন্তু এই বিদ্যুতের পরিমাণ বেশি হইলে মুস্কিল হয়।

তখন কেন্দ্রে ধন-বিদ্যুৎ থাকিয়া যায়। এই ধন-বিদ্যুৎই পরমাণুর বহিরাকাশের ইলেক্‌ট্রন্‌গুলিকে আট্‌কাইয়া রাখে।

তাহা হইলে দেখ, সূর্য্য ও তাহার কতকগুলি গ্রহ লইয়া যেমন সৌর-জগৎ, কেন্দ্রের বিদ্যুৎ-কণা এবং তাহার চারিদিকের ইলেক্‌ট্রন্‌গুলিকে লইয়াই যেন এক-একটি পরমাণু। সৌর জগৎ একটা নিরেট্ জিনিষ নয়। সূর্য্য ও তাহার চারি পাশের গ্রহেরা অতি-অল্প জায়গা জুড়িয়া থাকে,—বাকি সব ফাঁকা। পরমাণুর অবস্থাও তাই,—মাঝের ধন-বিদ্যুৎ ও ইলেক্‌ট্রন্ এবং তাহার চারিদিকের আরো কতকগুলি ইলেকট্রন্ লইয়াই পরমাণু। কাজেই, পরমাণুর গর্ভের অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা থাকিবার কথা। কিন্তু সত্যই ফাঁকা কিনা, তাহা এখন জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। এই ব্যাপারটি লইয়াও অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। ইহার ফল কি হইবে এখন বলা যাইতেছে না।

পরমাণু কত অল্প জায়গা জুড়িয়া থাকে, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সেই একটুখানি জায়গায় যে-সব ইলেক্‌ট্রন্ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেগুলি কত ছোটো তোমরা আন্দাজ করিতে পার কি?

বাস্তবিকই আন্দাজ করা দায়। এক জন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, একটা পরমাণুকে যদিও ইংলণ্ডের সেণ্ট্ পল্ গির্জ্জার গম্বুজ বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাহার তুলনায় এক একটা ইলেক্‌ট্রন্ হইয়া দাঁড়ায় ছুঁচের আগার মতো ছোটো জিনিষ। অর্থাৎ খুব একটা বড় জালাকে তোমরা যদি পরমাণু বলিয়া মনে কর, তবে এক-একটি ইলেক্‌ট্রন্ একটা সরিষার এক শত ভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোটো হয়। ভাবিয়া দেখ, এগুলি কত ছোটো। ইলেক্‌ট্রনের চেয়ে ছোটো জিনিষ বুঝি এই ব্রহ্মাণ্ডে নাই।

কোনো জিনিষ যখন ঘুরিয়া বেড়ায় বা আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, তখন বুঝিতে হয়, তাহার উপরে কোনো শক্তি কাজ করিতেছে। মনে কর, তোমাদের সমতল খেলার মাঠে একটি ফুট্‌বল্ আঁকা-বাঁকা পথে কখনো বাঁয়ে, কখনো-বা ডাইনে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রতিদিনই খেলার সময়ে ফুট্‌বল্‌কে এই-রকমে ছুটিতে দেখা যায়। তাহার এই গতি কি-রকমে হয়, বলা যায় না কি ? তোমার পায়ের কিক্ পাইয়া যখন বল্ গোলের দিকে সোজা ছুটিতেছিল, তখন আর একজন তাহাতে অন্যদিকে কিক্ দিয়াছিল, তাই উহা সোজা না গিয়া

বাঁকিয়া গেল। সুতরাং কোনো জিনিষ সোজা পথ ছাড়িয়া যখন বাঁকিয়া চলে, তখন বুঝা যায় নিশ্চয়ই কোনো শক্তি তাহার উপরে কাজ করিতেছে। আমাদের এই পৃথিবী কেন গোলাকার পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো। কাছে আনিবার জন্য সূর্য্য পৃথিবীকে টানে, কিন্তু পৃথিবী এক সোজা পথে সূর্য্য হইতে দূরে পলাইবার চেষ্টা করে। এই দো-টানায় পড়িয়া পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে দিবারাত্রি ঘুরিয়া মরে। ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি পরমাণুর ভিতরে যে-বলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা কোথা হইতে আসে, বোধ করি তোমরা জানো না। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ধন-বিদ্যুৎ এবং ইলেক্‌ট্রনে থাকে ঋণ-বিদ্যুৎ। কাজেই ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে এবং কেন্দ্রের ধন-বিদ্যুৎ সেগুলিকে নিজের কাছে টানিতে চায়। ইহার ফল কি হয়, তাহা অনায়াসেই বলা যায়,—ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি কেন্দ্রের ধন-বিদ্যুতের চারিদিকে কেবল ঘুরিয়াই মরে। একবার ভাবিয়া দেখ, এক-একটা ছোটো পরমাণুর মধ্যে কি কাণ্ডই চলিতেছে! বৈজ্ঞানিকেরা এক-একটা পরমাণুকে যে এক-একটা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলেন, একথা মিথ্যা নয়।

লোহার পরমাণুর সঙ্গে সোনার পরমাণুর তফাৎ আছে। তাহাদের ভার এক নয়, এবং তাহাদের গুণও পৃথক্। এই জন্য কোন্‌টা লোহা এবং কোন্‌টাই বা সোনা তাহা আমরা চট্ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সোনা লোহা কয়লা গন্ধক প্রভৃতি ৯৫টা মূল পদার্থের পরমাণুতে যে-সব ইলেক্‌ট্রন্ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেগুলি হুবহু এক; তাহাদের আকৃতি এক, তাহাদের প্রকৃতি এক, তাহাদের সকলি এক। তাহা হইলে বলিতে হয়, এই ব্রহ্মাণ্ডে যত জিনিষ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি গোড়ায় ইলেক্‌ট্রন্ দিয়া তৈয়ারি। ইলেক্‌ট্রন্ যে কি বস্তু তাহা তোমরা জানো,—এক-এক কণা ঋণ-বিদ্যুৎ ছাড়া তাহাতে আর কিছুই নাই। তাহারাই আর একটু ধন-বিদ্যুতের চারিধারে ঘুরিয়া কখনো লোহার পরমাণু, কখনো সোনার পরমাণু, কখনো-বা আর একটা কিছুর পরমাণুর রূপ পাইতেছে। তবেই বলিতে হয়, এই যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাহার গোড়ায় বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নাই। পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা আজ এক বাক্যে তাহাই বলিতেছেন। সৃষ্টির এই রূপ রস গন্ধ এবং মনোরম শোভার তলায় কেবল বিদ্যুৎই আছে। কথাটা আশ্চর্য্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান ইলেক্‌ট্রনের আকৃতি-প্রকৃতি যদি একই হয়, তবে তাহা দিয়া কখনো সোনার পরমাণু, কখনো রূপার পরমাণু এবং কখনো বা কয়লার পরমাণুর সৃষ্টি হয় কি-রকমে? সোনা ও কয়লার রূপ আলাদা, ভার আলাদা,—সবই আলাদা। এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, নানা দ্রব্যের পরমাণুর এই যে বিচিত্রগুণ, তাহা উহাদের ভিতরকার ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। হাইড্রোজেনের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরে কেবল একটি মাত্র ইলেক্‌ট্রন্ ঘুরপাক্ খায়, তাই ইহা হাইড্রোজেনের সব গুণ পাইয়াছে। লোহার পরমাণুর ভিতরে ছাব্বিশটি ইলেক্‌ট্রন্ ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই লোহার সব গুণ এই পরমাণুতে দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো জিনিষে একটি ইলেক্‌ট্রন্ থাকে না। এই জন্য এক হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো জিনিষে হাইড্রোজেনের গুণ দেখা যায় না। এই রকমে জগতের প্রত্যেক মূল বস্তুর পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা পৃথক্ থাকে বলিয়া তাহাদের গুণ পৃথক্ হয়। ইহাও কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

ছোটো খোঁটায় সরু দড়ি দিয়া একটি ছাগলকে

বাঁধিয়া রাখা চলে। খোঁটার জোর কম এবং ছাগলের জোর কম, কাজেই, সে খোঁটা উপ্‌ড়াইয়া পলাইতে পারে না। কিন্তু সেই খোঁটায় একটা বড় গরু বাঁধিলে কি হয়, বলা যায় না কি? সে এক টানে খোঁটা উপ্‌ড়াইয়া ছুট্ দেয়। কাজেই, যে-গরুর যত বেশি জোর, তাহার খোঁটাকে তেমনি বড় ও শক্ত করা দরকার। পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি কোন্ খোঁটায় বাঁধা থাকিয়া ঘানির নাক-ফোঁড়া বলদের মতো ঘুরপাক খায়, তোমাদিগকে তাহা আগেই বলিয়াছি। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ধন-বিদ্যুৎ। তাহাই ঋণ-বিদ্যুৎময় ইলেক্‌ট্রন্‌গুলিকে টানিয়া ঘুরপাক্ খাওয়ায়। কিন্তু সব পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা সমান থাকে কি? কখনই থাকে না। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে থাকে একটা, অক্সিজেনে থাকে আট্‌টা, লোহায় থাকে ছাব্বিশটা। সুতরাং হাইড্রোজেন্ পরমাণুর কেন্দ্রের যে ধন-বিদ্যুৎ একটা ইলেক্‌ট্রনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, লোহার পরমাণুর ছাব্বিশটা ইলেক্‌ট্রন্‌কে তাহা সাম্‌লাইতে পারে না,—সাম্‌লাইতে গেলে লোহার পরমাণুর কেন্দ্রে ধন-বিদ্যুৎ বেশি থাকা দরকার হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে-পরমাণুর

ভিতরে ইলেক্‌ট্রন্-সংখ্যা বেশি, তাহার কেন্দ্রে ধন-বিদ্যুতের পরিমাণও বেশি।

আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিয়ো, কোনো জিনিষের কোনো পরমাণুতে এখন যে-কয়েকটি ইলেক্‌ট্রন্ রহিয়াছে, সেগুলি চিরকালই সেখানে আট্‌কাইয়া থাকে না। পাশের পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে তাহাদের আদান-প্রদান চলে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বিষয়টা ভালো বুঝিতে পারিবে। মনে কর, কোনো জায়গায় যেন দুইটি অক্সিজেনের পরমাণু রহিয়াছে। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, ইহার প্রত্যেক পরমাণুতে আটটি করিয়া ইলেক্‌ট্রন্ থাকে। কাজেই, প্রথম পরমাণুতে আটটি এবং দ্বিতীয়টিতে আটটি ইলেক্‌ট্রন রহিয়াছে। আজকালকার পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, প্রথমের আটটি চিরকালই প্রথমের অধিকারে বাঁধা থাকে না। তাহার দুই-একটা ইলেক্‌ট্রন্ ছিট্‌কাইয়া দ্বিতীয়ের ভিতরে যায়। আবার দ্বিতীয়ের দু-একটা প্রথমে আসিয়া আট্‌কাইয়া পড়ে। পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্‌ট্রনের এই রকম আদান-প্রদান কম-বেশি সব জিনিষের ভিতরেই আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই রকম

বন্ধনমুক্ত ইলেক্‌ট্রনের নাম দিয়াছেন মুক্ত-ইলেক্‌ট্রন্‌। এক টুক্‌রা লোহা বা তামায় কতগুলি পরমাণু আছে, তোমরা বলিতে পার কি? গোণা চলে না,—কোটি কোটি—অসংখ্য। এখন প্রত্যেক পরমাণু হইতে যদি দুই-চারিটা করিয়া ইলেক্‌ট্রন্‌ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই সব মুক্ত-ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা কত হয় ভাবিয়া দেখ। ইহাদেরও সংখ্যা গুণিয়া শেষ করা যায় না,—কোটি-কোটি—অসংখ্য! তাহা হইলে দেখ, প্রত্যেক ধাতু বা অধাতু জিনিষের পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্‌ট্রন্‌ ছাড়া অসংখ্য মুক্ত-ইলেক্‌ট্রন্‌ও অবিরাম এলোমেলো-ভাবে চলাফেরা করিতেছে। ভাবিয়া দেখ, খুব ছোটো এক টুক্‌রা জিনিষের মধ্যে ইলেক্‌ট্রনের কি তাণ্ডব নৃত্যই চলিতেছে!

এ পর্য্যন্ত যে-সব কথা বলিলাম, তোমরা যদি সেগুলি বুঝিয়া থাকো, তাহা হইলে বিদ্যুৎ জিনিষটা যে কি এবং তাহা কেন কতক জিনিষের ভিতর দিয়া অবাধে চলে ও কতক জিনিষে বাধা পায়, তাহা জানিতে পারিবে। কেবল ইহাই নয়, কেন কোনো জিনিষে চুম্বক-শক্তি দেখা যায় এবং কোনো জিনিষে তাহার একটুও লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এই সকল প্রশ্নেরও

উত্তর পাওয়া যাইবে। পঁচিশ বৎসর আগেকার পণ্ডিতেরা বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে যে-সব বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না, আজকাল ইলেক্‌ট্রন্ দ্বারা সেগুলির কারণ প্রত্যক্ষ জানা যাইতেছে। একে একে তোমাদিগকে তাহার কথা বলিব।

পরমাণুর গঠন এবং ইলেক্‌ট্রন্-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাই চরম বলিয়া মনে করিয়ো না। সর্ব্বদেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল পরমাণুর গঠন লইয়া নানা গবেষণা করিতেছেন। ইহার ফলে, বৎসরে বৎসরে এ-সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করা যাইতেছে। তাই আজ যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে, দুই বৎসর পরে তাহাকেই মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করা অসম্ভব হইবে না। এজন্য ইলেক্‌ট্রনের বিষয়টি অতি-সঙ্কোচের সহিত তোমাদিগকে এখন বলিতে হইল।

ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের পরিচালন

তোমরা আগের পরীক্ষায় দেখিয়াছ, কাচকে রেশম দিয়া ঘষিলে কাচে ধন-বিদ্যুৎ এবং রেশমে ঋণ-বিদ্যুৎ জন্মে। কেন জন্মে, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা ইলেক্‌ট্রনের সাহায্যে তাহার কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, রেশমের ঘষা পাইলে কাচের পরমাণুর কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন্ রেশমে আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি ঋণ-বিদ্যুতের কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই, কাচের পরমাণু কতক ঋণ-বিদ্যুৎ হারাইলে তাহা ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে এবং রেশম কাচের ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ঋণ-বিদ্যুৎ পাইয়া সেই বিদ্যুতেরই লক্ষণ দেখাইতে থাকে। কিন্তু রেশম কেন কাচের ইলেক্‌ট্রনকে হরণ করে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই। তা' ছাড়া যে-কাচ রেশমের ঘষা পাইয়া ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হইল, তাহা পশমের ঘর্ষণে কেন ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ হয়, তাহারো কারণ এ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

পরিচালক ও অপরিচালক জিনিষ কাহাকে বলে, তোমাদের আগেই তাহা বলিয়াছি। যে-সব জিনিষ দিয়া বিদ্যুৎ অনায়াসে চলা-ফেরা করিতে পারে, সেইগুলিই পরিচালক বস্তু এবং যাহার ভিতর দিয়া চলিতে বিদ্যুৎ বাধা পায়, তাহা অপরিচালক বস্তু। এই দুইটি গুণ নানা পদার্থে কি-রকমে উৎপন্ন হয়, ইলেক্‌ট্রনের সাহায্যে তাহা বলা চলে। আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, ধাতু প্রভৃতি যে-সব জিনিষকে আমরা পরিচালক দ্রব্য বলি, তাহাদের পরমাণুর ভিতরকার ইলেক্‌ট্রন্ সহজে এদিকে ওদিকে চলাফেরা করিতে পারে। অপরিচালক জিনিষের ইলেক্‌ট্রনের সে-শক্তি থাকে না। তাহাদের ইলেক্‌ট্রন্ পরমাণুর ভিতরেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। তাই অপরিচালক জিনিষে বিদ্যুতের চলাচল নাই।

বিদ্যুতের আবেশ (Induction)

তোমরা চুম্বকের পরীক্ষায় দেখিয়াছ, কোনো চুম্বকের উত্তর বা দক্ষিণ-মেরুর কাছে একখণ্ড কোমল লোহা রাখিলে, তাহার একদিকে দক্ষিণ এবং অন্য দিকে উত্তর মেরুর আবেশ হয়। সেই রকম কোনো জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিয়া তাহার কাছে যদি আর একটা পরিচালক দ্রব্যকে রাখা যায়, তবে তাহাতে আপনা হইতেই বিদ্যুতের আবেশ হয়।
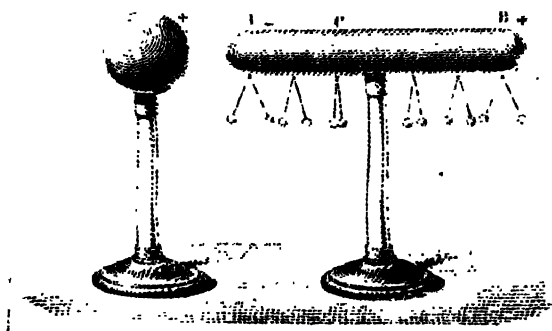
বিদ্যুতের আবেশ

একটা পরীক্ষার বিবরণ দিতেছি। এই পরীক্ষায় তোমরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবে। উপরের ছবিতে "ক"

একটা ধাতুর ফাঁপা গোলক। ইহা একটা কাচের খোঁটার উপরে বসানো আছে। কাচ বিদ্যুতের অপরিচালক। তাই বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে উহার বিদ্যুৎ খোঁটা দিয়া পলাইতে পারে না। "C" আর একটা ধাতুময় পরিচালক জিনিষ। ইহাকেও কাচের খোঁটার উপরে বসানো হইয়াছে। তা'ছাড়া ইহার নীচে বৈদ্যুত-দোলকের মতো ছয় জোড়া সোলার টুক্‌রা লাগানো আছে। বিদ্যুৎ-যুক্ত হইলে সোলার টুক্‌রার মধ্যে বিকর্ষণ দেখা যায়। এখন, "S" গোলকটিকে ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ করিয়া "C"-এর কাছে আনা হইয়াছে। দেখ, ইহাতে "C"-এর A-চিহ্নিত জায়গায় ঋণ-বিদ্যুৎ এবং B জায়গায় ধন-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, "S"-গোলকের ধন-বিদ্যুৎ দ্বারা তাহার কাছের "C"-গোলকের "A"-চিহ্নিত জায়গায় ঋণ-বিদ্যুৎ এবং দূরে "B" জায়গায় ধন-বিদ্যুতের আবেশ হইল। সেই রকমে "S" গোলককে ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ করিয়া যদি "C"-এর কাছে আনা যায়, তাহা হইলে উহার A-প্রান্তে ধন-বিদ্যুৎ এবং B-প্রান্তে ঋণ-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া পড়িবে। চুম্বকের কাছে কোমল লোহাকে রাখিলে তাহাতে যেমন

চুম্বক-শক্তির আবেশ হয়, ইহা ঠিক্ সেই রকমেরই ব্যাপার নয় কি? যাহাতে চুম্বক-শক্তি ছিল না, চুম্বকের কাছে থাকিয়া তাহা চুম্বক-শক্তি পাইয়াছিল। এখানেও তাহাই দেখা গেল। যাহাতে একটুও বিদ্যুৎ ছিল না, বিদ্যুতের কাছে রাখায় তাহাতে বিদ্যুতের আবেশ হইল।

এখন ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ "S"-কে দূরে লইয়া যাও। দেখিবে, "C"-তে আর একটুও বিদ্যুতের চিহ্ন নাই। কোমল লোহাকে চুম্বকের কাছ হইতে সরাইলে তাহাতে যেমন আর চুম্বকের শক্তি থাকে না, ইহা ঠিক্ সেই রকমেরই ব্যাপার।

চুম্বকের কাছে রাখিলে কেন লোহাতে চুম্বক শক্তির আবেশ হয়, তোমাদিগকে তাহার কথা আগে বলিয়াছি। বিদ্যুতের কাছে কোনো পরিচালক জিনিষকে রাখিলে, তাহাতে কি-রকমে বিদ্যুতের আবেশ হয়, তাহাই এখন তোমাদিগকে বলিব। বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক দুই সিদ্ধান্ত দিয়াই ইহার কারণ দেখানো চলে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, প্রত্যেক জিনিষেই সমান সমান পরিমাণে ধন ও ঋণ-বিদ্যুৎ থাকে। এই

দুই বিদ্যুৎ পরস্পরকে টানিয়া রাখে বলিয়া সাধারণ অবস্থায় কোনো জিনিষে বিদ্যুতের চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু যেই দুই বিদ্যুতের একটিকে নষ্ট করা যায় বা পৃথক্ রাখা যায়, অমনি অপরটি নিজের পরিচয় দিতে থাকে। আগেকার পরীক্ষায় "S" ধন বিদ্যুতে পূর্ণ ছিল। ধন-বিদ্যুৎ, ঋণ-বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। কাজেই "S"-এর ধন-বিদ্যুৎ, "C"-এর ঋণ-বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করিয়া "A"-চিহ্নিত জায়গায় আট্‌কাইয়া রাখিল এবং "C"-এর অবশিষ্ট ধন-বিদ্যুৎ দূরে যাইবার জন্য "B"-চিহ্নিত জায়গায় আশ্রয় লইল। বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষকে কাছে রাখিলে অপর পরিচালক জিনিষে এই রকমেই বিদ্যুতের আবেশ হয়। এই আবিষ্ট বিদ্যুতের কোন্ জাতি কোন্ দিকে আশ্রয় লয়, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। ধন-বিদ্যুতের দ্বারা যদি কোনো জিনিষে বিদ্যুতের আবেশ হয়, তবে তাহাতে ঋণ-বিদ্যুৎ জমা হয় ঐ ধন-বিদ্যুতের নিকটের অংশে এবং ধন-বিদ্যুৎ চলিয়া যায় দূরে। ঋণ-বিদ্যুৎ দ্বারা আবেশ হইলে আবার ইহারি উল্‌টা ব্যাপার দেখা যায়। তখন ধন-বিদ্যুৎ জমে কাছে এবং ঋণ-বিদ্যুৎ চলিয়া যায় দূরে।

বিদ্যুৎ-হীন জিনিষে বিদ্যুতের আবেশ কেন হয়, ইলেক্‌ট্রনের সাহায্যেও ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। পূর্ব্বের পরীক্ষায় "S" গোলক ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ ছিল। কাজেই, তাহা "C" জিনিষের পরমাণুর অনেক ইলেক্‌ট্রন্‌কে টানিয়া "A" জায়গায় জড় করিয়াছিল। কিন্তু ঋণ-বিদ্যুৎ এবং ইলেক্‌ট্রন্‌ একই জিনিষ। ইহাতেই আমরা "A" জায়গায় ঋণ-বিদ্যুৎ দেখিতে পাইয়াছিলাম, এবং "B" প্রান্তে ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ ইলেক্‌ট্রনের অভাব হওয়ায় সেখানে কেবল পরমাণুর ভিতরকার ধন-বিদ্যুতেরই চিহ্ন দেখা গিয়াছিল।

পর-পৃষ্ঠায় আর একটি পরীক্ষার ছবি দিলাম। এখানেও আগের মতো "S" ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ। কাজেই "C"-এর "A" প্রান্তে ঋণ-বিদ্যুৎ এবং "B" প্রান্তে ধন-বিদ্যুতের আবেশ হইয়াছে। ছবিতে দেখ, "B" প্রান্ত একটা তার দিয়া মাটির সহিত সংযুক্ত করা আছে। এই অবস্থায় "C"-এর বিদ্যুতের অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? "S"-এর ধন-বিদ্যুৎ "A" জায়গায় ঋণ-বিদ্যুৎকে টানিয়া রাখিয়াছে,—মুক্ত আছে কেবল "B" জায়গার ধন-বিদ্যুৎ। কাজেই, এই মুক্ত-বিদ্যুৎ তার দিয়া মাটিতে নামিয়া লোপ পাইবে,—বাকি

থাকিবে কেবল ঋণ-বিদ্যুৎ। এখন তারটিকে খুলিয়া "S"-কে দূরে লইয়া যাও। দেখিবে যে-ঋণবিদ্যুৎ "A" প্রান্তে আট্‌কাইয়াছিল, তাহা ছড়াইয়া সমস্ত "C"-কে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিতেছে। তার না দিয়াও এই পরীক্ষা
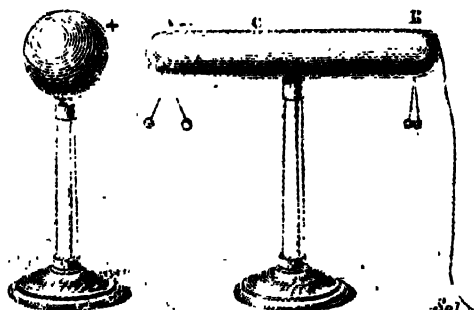
বিদ্যুতের আবেশ

করা চলে। "A" এবং "B" জায়গায় বিদ্যুতের আবেশ হইলে মুহূর্ত্তের জন্য "C"-কে আঙুল দিয়া ছুঁইলে "B" প্রান্তের সমস্ত মুক্ত ধন-বিদ্যুৎ শরীরের ভিতর দিয়া মাটিতে চলিয়া যায়। তখন বাকি থাকে কেবল "A" প্রান্তের ঋণ-বিদ্যুৎ। এখন "S"-কে

সরাইয়া লইলেই সেই ঋণ-বিদ্যুৎ বন্ধন-মুক্ত হইয়া "C"-এর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং দেখ, "C" জিনিষটাকে কেবল আবেশের সাহায্যে বিদ্যুৎ-যুক্ত করা গেল। কাজেই বলিতে হয়, ঘর্ষণ দ্বারা বা বিদ্যুৎ ছোঁয়াইয়া যেমন কোনো জিনিষকে বিদ্যুৎ-পূর্ণ করা হয়, তেমনি পরিচালক জিনিষকে বিদ্যুতের কাছে আনিয়াও বিদ্যুৎ-যুক্ত করা চলে।

আমরা চুম্বক-শক্তির আবেশের সঙ্গে বিদ্যুতের আবেশের তুলনা করিয়াছি। কিন্তু এই দুই আবেশের মধ্যে তফাৎ অনেক আছে। কোনো চুম্বকের উত্তর-মেরুকে একটা লোহার গায়ে ঠেকাইয়া রাখো। চুম্বক যেখানে লোহাকে স্পর্শ করিয়াছে সেখানে দক্ষিণ-মেরুর আবেশ হইবে। কিন্তু ধন বা ঋণ-বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষকে যদি ঐরকমে কোনো পরিচালক জিনিষের গায়ে লাগানো যায়, তাহা হইলে বিদ্যুতের আবেশ হয় না। তখন বিদ্যুতের খানিকটা পরিচালক জিনিষে গিয়া তাহাকে সেই বিদ্যুতে বিদ্যুৎ-যুক্ত করে। তার পরে দেখ, চুম্বক কেবল লোহা নিকেল কোবাল্ট্ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুতেই চুম্বক-শক্তির আবেশ করে। বিদ্যুতের আবেশ সে-রকম বিশেষ বিশেষ জিনিষে

হয় না। বিদ্যুতের কাছে যে-কোনো পরিচালক জিনিষকে রাখো, দেখিবে, তাহাতে বিদ্যুতের আবেশ হইয়াছে। সুতরাং চুম্বক-শক্তির আবেশ এবং বিদ্যুতের আবেশের মধ্যে তফাৎ অনেক।

বিদ্যুতের বল-ক্ষেত্র ও বল-রেখা

চুম্বকের চারিদিকেকি-রকম বল-ক্ষেত্র থাকে, তোমা-দিগকে আগে "চুম্বকে" তাহা ছবি দিয়া বুঝাইয়াছি। এই বল-ক্ষেত্রে বল-রেখাগুলি দুই মেরুতে সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষেরও চারিদিকে সেই রকম বল-ক্ষেত্র ও বল-রেখা আছে। রেখাগুলি ধন-বিদ্যুৎ হইতে বাহির হইয়া ঋণ-বিদ্যুতের দিকে বিস্তৃত থাকে। ক্ষেত্রের কোন্ কোন্ জায়গায় বিদ্যুৎ-শক্তি কোন্ দিক্ ধরিয়া কাজ করিতেছে, তাহা বল-রেখাগুলি দেখিলেই বলা যায়।

পরপৃষ্ঠার ছবিখানি দেখ। ইহাতে "S" ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ একটি ধাতু-গোলক এবং "C" একটি পরিচালক জিনিষ আঁকা আছে। কাজেই, জিনিষটির "A" জায়গায় ঋণ-বিদ্যুৎ এবং "B" জায়গায় ধন-বিদ্যুতের আবেশ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, ছবির বল-রেখাগুলি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। "C"-এর "A" প্রান্তে যে-সব বল-রেখা প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে

ঐ জায়গাটায় ঋণ-বিদ্যুৎ জমিয়াছে এবং "B" প্রান্ত দিয়া রেখাগুলি বাহিরে গিয়াছে বলিয়া সেখানে ধন-বিদ্যুতের আবেশ হইয়াছে। চুম্বকের বল-রেখাতেও
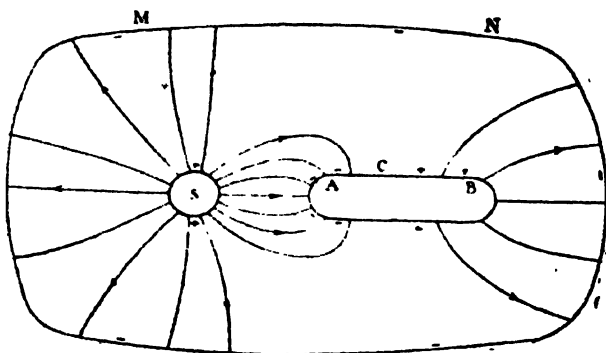
বৈদ্যুত বল-রেখা

তোমরা এই রকম ব্যাপারই দেখিয়াছিলে। লোহার যে-প্রান্তে চুম্বকের বল-রেখা প্রবেশ করিয়াছে তাহা দক্ষিণ-মেরু এবং যে-প্রান্ত দিয়া সেগুলি বাহির হইয়াছিল সেখানে উত্তর-মেরু দেখা গিয়াছিল।

বৈদ্যুত যন্ত্র

কাচের ডাণ্ডাকে রেশম দিয়া ঘষিলে কাচে ও রেশমে বিদ্যুৎ হয়। কিন্তু ইহাতে বিদ্যুতের পরিমাণ এত অল্প হয় যে, সব সময়ে তাহা দিয়া পরীক্ষা দেখানো চলে না। তাই বেশি বিদ্যুৎ পাইতে হইলে কোনো বৈদ্যুত যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যন্ত্রের হাতল ঘুরাইলে এগুলিতে এত বিদ্যুৎ জমা হয় যে, চারি-পাঁচ ইঞ্চি তফাতে হাত রাখিলে যন্ত্রের বিদ্যুৎ লাফাইয়া হাতে আসিয়া ঠেকে। আমরা এখানে কেবল দুই রকম বৈদ্যুত যন্ত্রের কথা তোমাদিগকে বলিব।

পরপৃষ্ঠায় যে-যন্ত্রের ছবি দিলাম, তাহা প্রায় দেড় শত বৎসর আগে র‍্যাম্‌স্‌ডেন (Ramsden) নামে এক বৈজ্ঞানিক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহাকে র‍্যামস্‌ডেনের যন্ত্র বলা হয়। দেখ, দুইটা কাঠের খাম্বায় একটা মোটা কাচ লাগানো আছে। হাতল ঘুরাইলে কাচখানা গাড়ির চাকার মতো ঘুরিতে থাকে। "C"-চিহ্নিত অংশ দুটি রেশমী
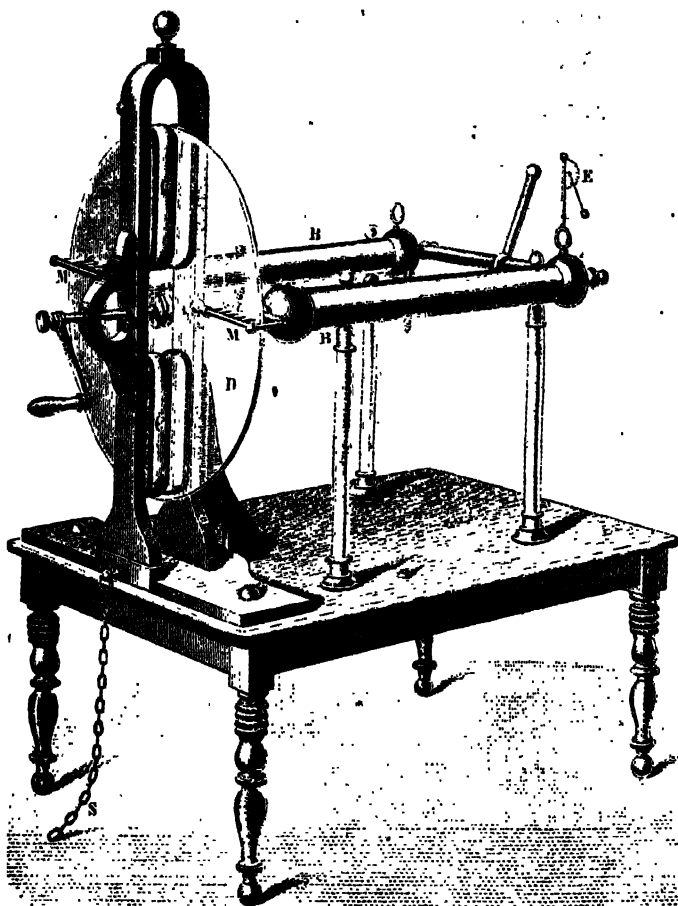
র‍্যাম্‌স্‌ডেনের বৈদ্যুত-যন্ত্র

কাপড়ে বা চাম্ড়ার মোড়া ছোটো গদি। এগুলি দুই পাশেই কাচকে একটু জোরে চাপিয়া আছে। বুঝিতেই পারিতেছ, কাচের চাকা যখন জোরে ঘোরে, তখন ঐ গদির ঘষা পাইয়া তাহা ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে। তার পরে দেখ, যন্ত্রের দুই পাশে "B" চিহ্নিত দুইটি ধাতুর ডাণ্ডা রহিয়াছে। সেগুলি দাঁড়াইয়া আছে চারিটি কাচের খোঁটার উপরে। এই ব্যবস্থা আছে বলিয়াই যখন "B" বিদ্যুৎ-যুক্ত হয়, তখন তাহাদের বিদ্যুৎ মাটিতে পলাইতে পারে না। কেবল ইহাই নয়, দেখ "B"-এর প্রান্তে "M" জায়গায় চিরুণির মতো ধাতুর দাঁত লাগানো আছে। কাচ যখন এই কাঁটাগুলির মাঝে থাকিয়া ঘোরে, তখন ইহাতে বিদ্যুৎ জমা হয়। এত বিদ্যুৎ হয় যে, দুই তিন ইঞ্চি তফাতে কোনো জিনিষ রাখিলে তাহার গায়ে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া আসে।

কি-রকমে বিদ্যুৎ জমে, তাহা ঠিক করা কঠিন নয়। রেশমি গদির ঘর্ষণে কাচে ধন-বিদ্যুৎ এবং গদিতে ঋণ-বিদ্যুৎ জন্মে। গদির বিদ্যুৎ সেখানে জমিতে পায় না। তাহা ছবির লোহার শিকল দিয়া এবং কাঠ দিয়া মাটিতে চলিয়া যায়। সুতরাং বাকি থাকে

কেবল কাচের ধন-বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষের কাছে, অন্য পরিচালক জিনিষ রাখিলে, তাহাতে বিদ্যুতের আবেশ হয়, ইহা তোমাদের জানা আছে। কাজেই এখানে কাচের ধন-বিদ্যুৎ "B"-এর ডাইনে ঋণ-বিদ্যুৎ এবং বাঁয়ে ধন-বিদ্যুতের আবেশ করিবে। কিন্তু যেখানে ঋণ-বিদ্যুৎ জমিল সেখানে চিরুণির দাঁতের মতো কাঁটা লাগানো আছে। ছুঁচলো পথ পাইলেই বিদ্যুৎ সেই পথ দিয়া পলাইয়া যায়, ইহাও তোমরা জানো। এখানে তাহাই ঘটে। কাঁটার কাছের সব ঋণ-বিদ্যুৎ ছুঁচ্লো মুখ দিয়া বাহির হইয়া কাচের ধন-বিদ্যুতের সহিত মিলিয়া যায়। সুতরাং বাকি থাকে কেবল "B"-এর ডাইন্ প্রান্তের ধন-বিদ্যুৎ। "B"-এর কাছে হাত রাখিলে এই বিদ্যুৎই লাফাইয়া হাতে আসে।

তাহা হইলে দেখ, র‍্যাম্‌স্‌ডেনের যন্ত্রে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহা আবিষ্ট বিদ্যুৎ। ইহাতে কেবল ধন-বিদ্যুৎই পাওয়া যায়।

পরপৃষ্ঠায় আর একটি যন্ত্রের ছবি দিলাম। এই রকম যন্ত্র আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা হয়। ইহার নাম উইম্‌হর্ষ্টের (Wimhurst) বৈদ্যুত যন্ত্র। এই
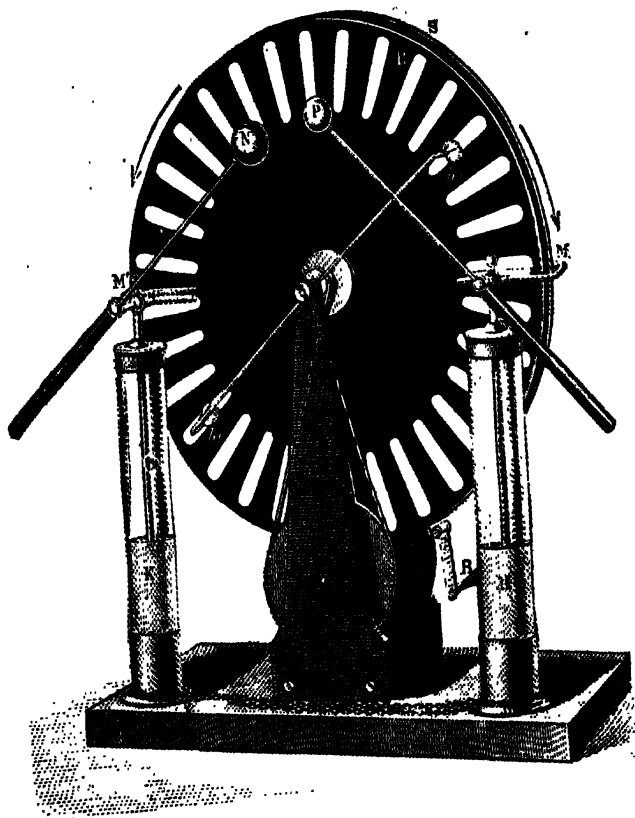
উইম্‌হর্ষ্টের বৈদ্যুত-যন্ত্র

যন্ত্রে বিদ্যুতের পরিমাণ খুব বেশি হয়। এই জন্যই ইহার এত আদর।

দেখ, এই যন্ত্রে “R” এবং “S”-চিহ্নিত দুইটা কাচ বা ইবনাইটের চাকা লাগানো আছে। চাকায় ভালো বার্নিশ লাগাইয়া তাহার বাহিরের দিকে কতকগুলি রাঙ্‌ বা অপর কোনো ধাতুর পাত লাগানো আছে। সাম্‌নের চাকায় যতগুলি পাত রহিয়াছে, পিছনের পাতায় ঠিক্ ততগুলিই আছে। “B”-চিহ্নিত হাতলকে ঘুরাইলে চাকা দু'খানি জোরে ঘুরিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এক দিকে ঘুরে না। সাম্‌নের চাকা যদি বাঁ হইতে ডাইনে ঘুরে, তাহা হইলে পিছনের চাকা ডাইন হইতে বাঁয়ে ঘুরিতে থাকে। C^1 C^2 একটি পিতলের শিক্। ইহার দুই প্রান্তে খুব সরু তারের ব্রস্ লাগানো আছে। পিছনের চাকার বাহিরের দিকেও ঐ রকম শিক্ ও ব্রস্ লাগানো থাকে। কিন্তু দুই দিকের শিক্ এলোমেলো ভাবে বসানো থাকে না। সাম্‌নের শিকের সঙ্গে পিছনের শিক্‌টিকে ঠিক্ সমকোণ করিয়া রাখা হয়। যখন চাকা ঘুরে, তখন শিকের ব্রস্ চাকার গায়ের ধাতুর পাতগুলিকে একে একে ছুঁইতে থাকে। দুইটা পিতলের ডাণ্ডাকে বাঁকাইয়া “M” এবং “M^1”

তৈয়ারি করা হইয়াছে। এই দুটি কাচের খোঁটার উপরে আছে এবং তাহাদের গায়ে আগের যন্ত্রের মতো ধাতুর চিরুণি লাগানো হইয়াছে। চাকা দু'খানি "M"এবং "M^1"-এর বাঁকা অংশের ভিতরে থাকিয়া ঘুরে,—কিন্তু চিরুণির দাঁত কাচের গায়ে ঠেকে না। দেখ, চিরুণির সঙ্গে "N" এবং "P" দুইটা পিতলের শিক্ লাগানো আছে এবং তাহাদের মাথায় আবার এক-একটা গোলক রহিয়াছে। যন্ত্রে বিদ্যুৎ জমিলে তাহা স্ফুলিঙ্গাকারে এক গোলক হইতে অন্য গোলকে লাফাইয়া যায়।

এই যন্ত্রে কাচের উপরে লাগানো ধাতুর পাতগুলি বিদ্যুৎকে বহন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর কাচের উপরকার পাতায় বিদ্যুতের আবেশ করে। এই-রকমে "N" এবং "P" দাণ্ডার একটিতে ধন-বিদ্যুৎ এবং অপরটিতে ঋণ-বিদ্যুৎ জমা হয়। বিদ্যুতের পরিমাণ যাহাতে খুব বেশি হইতে পারে, তাহার জন্য "N" ও "P"-এর তলায় লীডেন্ জার রহিয়াছে। লীডেন্ জারের কথা তোমরা এখনো জানো না,—পরে তাহার কথা বলিব। যাহা হউক, যখন "N" এবং "P"-তে অনেক বিদ্যুৎ জমে, তখন একের ধন-বিদ্যুৎ অন্যের ঋণ-বিদ্যুতের সঙ্গে স্ফুলিঙ্গাকারে মিশিয়া যায়।

তোমরা হয় ত লক্ষ্য করিয়াছ, বৈদ্যুত যন্ত্রের যেখানে বিদ্যুৎ জমা হয়, সেখানকার কোনো অংশকে কখনো ছুঁচ্‌লো রাখা হয় না। তাই র‍্যাম্‌স্‌ডেন এবং উইম্‌স্‌হর্ষ্ট যন্ত্রের অনেক অংশে ভাঁটার মতো গোলক লাগানো থাকে। বৈদ্যুত যন্ত্রের আকৃতি কেন এ-রকম হয়, বোধ করি তোমরা জানো না। আগেই বলিয়াছি, কোনো পরিচালক জিনিষকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে তাহার মোটা দিকের চেয়ে সরু দিকেই বিদ্যুৎ ঘন হইয়া জমে এবং তার পরে সেখান হইতে ঐ বিদ্যুৎ বাহিরে চলিয়া যায়। কাজেই বৈদ্যুত যন্ত্রের যে-সকল জায়গায় বিদ্যুৎ জমা হয়, সেখানে ছুঁচ্‌লো অংশ থাকিলে বিদ্যুৎ জমিতে পারে না। তাই বৈদ্যুত যন্ত্রের আশ-পাশ ছুঁচ্‌লো না করিয়া গোলাকৃতি করিয়া রাখা হয়।

বৈদ্যুত যন্ত্র হইতে বিদ্যুৎ পাইতে গেলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। অধিকাংশ বিদ্যুতের যন্ত্রকে কাচের খোঁটার উপরে দাঁড় করিয়া রাখা হয়। কাচ অপরিচালক, তাই যন্ত্রের বিদ্যুৎ কাচের খোঁটা দিয়া বাহিরে পলাইতে পারে না। অপরিচালক হইলেও কাচ সাধারণতঃ বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প টানিয়া নিজের গায়ে জমা রাখে। ইহা কাচের

একটা বড় খারাপ গুণ। জল, বিদ্যুতের পরিচালক, তাই কাচের গায়ের জলকে অবলম্বন করিয়া অনেক সময়েই বিদ্যুৎ বাহিরে চলিয়া যায়। তা'ছাড়া যন্ত্রের গায়ে ধূলা লাগিয়া থাকিলেও মুস্কিল হয়। তখন ধূলা অবলম্বন করিয়াও বিদ্যুৎ বাহির হইয়া পড়ে। এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য যন্ত্রগুলিকে বেশ ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ব্যবহার করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে কাচের খোঁটায় ও হাতলে গালার বার্ণিশ লাগাইতে হয়। গালা অপরিচালক দ্রব্য এবং তাহা কাচের মতো বাতাস হইতে জলীয় বাষ্প টানিয়া লয় না। তাই কাচের উপরে গালার পাত্‌লা প্রলেপ থাকিলে, জলীয় বাষ্পের উৎপাত কমে। তথাপি পরীক্ষা দেখাইবার আগে সব যন্ত্রকে কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে রাখা ভালো।

বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র

এখানে যে যন্ত্রটির বিবরণ দেওয়া হইল, তাহার ইংরেজি নাম Electrophorus। আমরা তাহাকে বিদ্যুৎ-স্ফুরক নাম দিলাম। অতি অল্প-পরিমাণে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিতে গেলে, তোমরা ইহা ব্যবহার করিয়ো। চেষ্টা করিলে তোমরা নিজে-নিজেই এই যন্ত্র তৈয়ারি করিতে পারিবে। ইহার জন্য দামী মাল-মশলার দরকার হয় না।
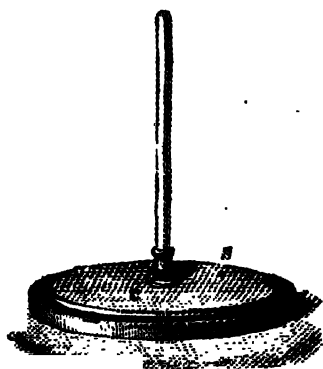
বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র—(১)

প্রায় দেড় শত বৎসর আগে ইটালির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভল্‌টা (Volta) বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ইহার আরো অনেক যন্ত্রের কথা তোমাদিগকে পরে বলিব।

যন্ত্রের ছবিটি দেখ। "S" একটি কাণাওয়ালা ধাতুর পাত্র। তাহার ভিতরটা জমাট গালা দিয়া ভর্ত্তি করা আছে। রজন বা গালার সঙ্গে টার্পিন তেল মিশাইলে যে-জিনিষটা পাওয়া যায়, পাত্রটিকে তাহা দিয়া ভর্ত্তি করিলেও কাজ চলে। কখনো কখনো আবার গন্ধক গালাইয়া পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। জমাট গালা বা রজনের বদলে জমাট গন্ধকেও কাজ চলিয়া যায়। "C" অংশটি একটা ধাতুর চাক্‌তি, তাহার হাতলটা কিন্তু কাচ বা অন্য কোনো অপরি-চালক জিনিষে তৈয়ারি। ধাতুর চাক্‌তি যদি না থাকে, তবে কাঠের চাক্‌তিতে রাঙ্‌ মুড়িয়া লইলেও কাজ চলে। কিন্তু হাতল অপরিচালক হওয়া চাই। বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্রে এই "S" এবং "C" ছাড়া অন্য কিছুই নাই।

ইহা দ্বারা কি কাজ পাওয়া যায়, এখন দেখা যাউক্‌। মনে কর, যন্ত্রের গালায় ফ্লানেল্‌ ঘষিয়া, তাহার উপরে ধাতুর চাক্‌তিকে রাখা গেল। ইহাতে কি হইবে বলা যায় না কি? ফ্লানেলের ঘষায় গালা ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়াছে। কাজেই, ধাতুর চাক্‌তির তলায় ধন-বিদ্যুৎ এবং উপরে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ

করিবে। কেবল ইহাই নয়, যে-ধাতুর পাত্রে গালা আছে, তাহার তলাতেও ধন-বিদ্যুৎ জমিবে এবং উহার মুক্ত ঋণ-বিদ্যুৎটুকু মাটিতে চলিয়া যাইবে।

এখন মনে কর, পাশের ছবির মতো ধাতুর চাক্তিকে মুহূর্ত্তের জন্য আঙুল দিয়া ছোঁয়া গেল। ইহাতে চাক্তির বিদ্যুতের অবস্থা কি হইবে, হয় ত তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। চাক্তির তলার ধন-বিদ্যুৎকে গালার ঋণ-বিদ্যুৎ আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। কাজেই, চাক্তির উপরে যে মুক্ত ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ হইয়াছিল, কেবল সেইটুকুই আঙুল দিয়া বাহির হইয়া যাইবে,—উহার তলার ধন-বিদ্যুতের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। ইহার পরে পরপৃষ্ঠার ছবির মতো চাক্তিখানিকে হাতল ধরিয়া গালা হইতে উঠাইলেই, তলাকার সেই ধন-বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিবে। এই সময়ে ছবির মতো করিয়া তোমরা চাক্তির কাছে আঙুল
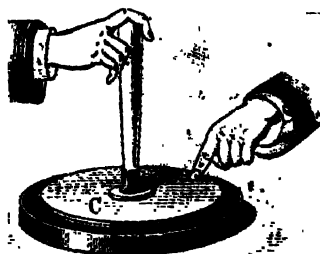
বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র—(২)

রাখিয়ো। দেখিবে, তাহার বিদ্যুৎ পুট্‌পুট্‌ শব্দ করিয়া আঙুলে লাগিতেছে।

স্ফুরক-যন্ত্রে স্ফুলিঙ্গ

তাহা হইলে দেখ, ধাতুর চাক্‌তিকে গালার উপরে রাখা, আঙুল দিয়া ছোঁওয়া এবং শেষে হাতল ধরিয়া তাহাকে গালার উপর হইতে উঠানো,—এই তিন প্রক্রিয়াতে একটু-একটু বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। চাক্‌তিকে হাজার বার ঐরকমে গালার উপরে রাখো ও উঠাও,—তোমরা হাজার বারই একটু-একটু বিদ্যুৎ পাইবে। ইহাতে গালার বিদ্যুতের একটুও ক্ষয় হইবে না। কেন

ক্ষয় হইবে না, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। যখন কোনো বস্তুর বিদ্যুৎ অন্য কোনো বস্তুতে পরিচালিত হয়, তখনই বিদ্যুতের পরিমাণ কমিয়া আসে। কিন্তু কোনো বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষ যখন পাশের পরিচালক জিনিষে বিদ্যুতের আবেশ করে, তখন তাহার বিদ্যুতের পরিমাণ একটুও কমে না। বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্রের গালা তাহার উপরকার চাক্তিতে বিদ্যুতের আবেশ করে মাত্র। কাজেই, একবার ফ্লানেল্ ঘষিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারিলে, চাক্তি হইতে হাজার দু-হাজার বার বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো, পাত্রের গালাকে যখন ধাতুর চাক্তি দিয়া ঢাকা যায়, তখন গালার ঋণ-বিদ্যুৎ চাক্তিতে পরিচালিত হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। গালার উপরটা উপ্‌ড়া-খাপ্‌ড়া থাকে। তাই সমতল ধাতুর চাক্তিকে গালার উপরে রাখিলে তাহা গালার দুই-চারি জায়গায় ছুঁইয়া থাকে মাত্র। তাই গালার বিদ্যুৎ চাক্তিতে পরিচালিত হয় না; মাঝে বাতাসের ব্যবধান থাকায় গালার ঋণ-বিদ্যুৎ চাক্তির তলায় কেবল ধন-বিদ্যুতেরই আবেশ করে।

দেখ যন্ত্রটি কত সরল। তোমরা চায়ের কৌটার গোল ঢাক্‌নি বা কাণাওয়ালা ভাঙা রেকাবি লইয়া অতি-সহজে বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র তৈয়ারি করিতে পারিবে। উহাতে খানিকটা গলানো গন্ধক বা গালা ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিলে যন্ত্রের প্রধান অংশটা তৈয়ারি হইয়া যাইবে। তার পরে কাঠের একটা পাত্‌লা চাকাতে রাঙ মুড়িলেই চাক্‌তি হইবে। ইহাতে কাচের গালার বা অন্য কোনো অপরিচালক জিনিষের হাতল লাগাইয়া আগের মতো পরীক্ষা করিলেই তোমরা বিদ্যুৎ পাইবে। দেখিবে, চাক্‌তির বিদ্যুৎ চট্‌-চট্‌ করিয়া আঙুলে আসিতেছে। কিন্তু মনে রাখিয়ো, পরীক্ষায় সফল হইতে হইলে, আগে যন্ত্রগুলিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে গরম করা দরকার। বর্ষাকালে যখন চারিদিকের বাতাস জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে, তখন এই পরীক্ষা করিতে গেলে প্রায়ই বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না।

আবিষ্ট বিদ্যুতের কতকগুলি পরীক্ষা

বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষের কাছে থাকিলে পরিচালক জিনিষের এক প্রান্তে ধন এবং অন্য প্রান্তে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ হয়। এই ব্যাপারটি লইয়া অনেক রকম সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য পরীক্ষা দেখানো চলে। আমরা এখানে তাহাদেরি কয়েকটির বিবরণ দিব।

একটা কাচের ডাণ্ডায় রেশম ঘষিয়া তাহার কাছে কাগজের টুক্‌রা রাখিলে, সেগুলি লাফাইয়া ডাণ্ডার গায়ে লাগে। ইহা তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ। কিন্তু কেন ইহা ঘটে বলা হয় নাই। আবিষ্ট বিদ্যুৎই ইহার কারণ। কাচের ডাণ্ডায় ধন-বিদ্যুৎ আছে। কাজেই, এই বিদ্যুৎ কাগজের টুক্‌রাগুলির এক প্রান্তে ঋণ-বিদ্যুৎ এবং অপর প্রান্তে ধন-বিদ্যুতের আবেশ করিল। কাগজ পরিচালক দ্রব্য বলিয়া তাহার মুক্ত ধন-বিদ্যুৎটুকু মাটিতে চলিয়া গেল। তার পরে কাচের ধন-বিদ্যুতের টানে ঋণ-বিদ্যুৎ-সমেত কাগজের টুক্‌রা কাচের গায়ে আসিয়া ঠেকিল। মজার ব্যাপার নয় কি?

একটা বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্রের কাছে রেশম-দিয়া-ঘষা কাচের ডাণ্ডা রাখো। কাচের ডাণ্ডায় ধন-বিদ্যুৎ
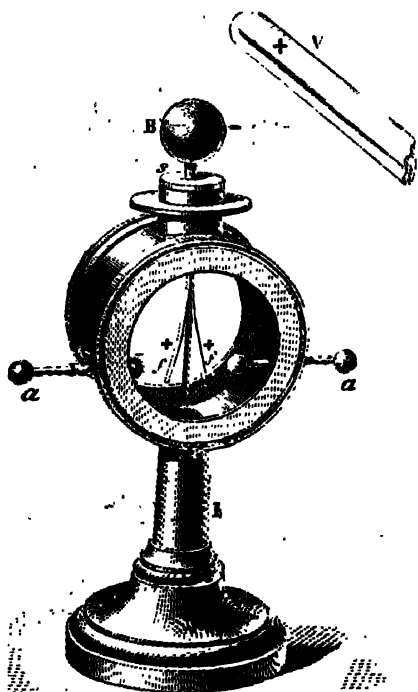
বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্র

আছে। এই অবস্থায় বিদ্যুৎ-দর্শকের পাত দুটির

অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? কাচে ধন-বিদ্যুৎ আছে। কাজেই, ডাণ্ডার কাছে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ হইল এবং ধন-বিদ্যুৎ বিকর্ষিত হইয়া দূরে সোনার পাতায় আশ্রয় লইল। কিন্তু একই বিদ্যুতে পূর্ণ দুই জিনিষ পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং সোনার পাত দুখানি ফাঁক হইয়া পড়িবে।

এখন যদি তুমি আঙুল দিয়া যন্ত্রের মাথাটি খুব অল্প ক্ষণের জন্য স্পর্শ কর, তাহা হইলে দেখিবে, সোনার পাতা দুইটিতে আর ফাঁক নাই,—তাহারা পরস্পর কাছাকাছি হইয়াছে। কেন ইহা ঘটিল, তোমরা হয় ত নিজেরাই বলিতে পারিবে। যন্ত্রের ঋণ-বিদ্যুৎ কাচের ধন বিদ্যুতের টানে আট্‌কাইয়া আছে,—মুক্ত আছে কেবল সোনার পাতের ধন-বিদ্যুৎ। কাজেই যখন তুমি আঙুল দিয়া যন্ত্রকে ছুঁইলে, তখন কেবল মুক্ত ধন-বিদ্যুৎটুকু তোমার শরীরের ভিতর দিয়া মাটিতে চলিয়া গেল। ইহাতেই সোনার পাতা দু'টি বিদ্যুৎ-হীন হইয়া কাছাকাছি আসিল।

এবারে কাচের ডাণ্ডাটিকে খুব দূরে সরাইয়া লও। দেখিবে, পাতা দু'টি আবার ফাঁক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধন-বিদ্যুতে-পূর্ণ কাচকে দূরে লইয়া যাওয়ায়, যে

ঋণ-বিদ্যুৎ আট্‌কাইয়া ছিল, তাহা বন্ধন-মুক্ত হইয়া সব জায়গায় ছড়াইয়া পড়িল। কাজেই, পাতা দু'টি একই বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পরস্পর তফাতে গেল।

মাইকেল ফ্যারাডের নাম বোধ করি তোমরা শুন নাই। তিনি ইংলণ্ডের একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন।
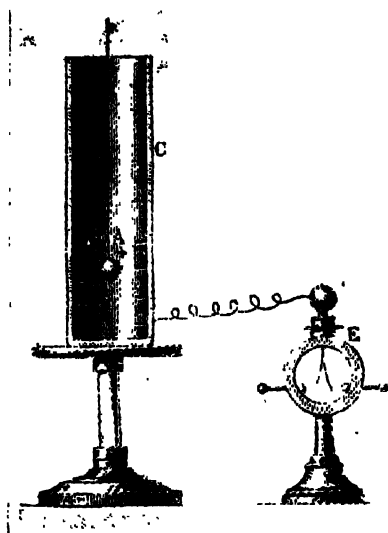
ফ্যারাডের পরীক্ষা

গত শতাব্দীতে তাঁহার দ্বারা বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইয়াছে। এখানে তাঁহারি একটি সুন্দর পরীক্ষার কথা বলিব। এখানকার

ছবিটির "C"-চিহ্নিত অংশ একটি ধাতুর পাত্র। বিদ্যুৎ-যুক্ত হইলে যাহাতে ইহার বিদ্যুৎ মাটিতে চলিয়া না যায়, তাহার জন্য পাত্রটিকে একটা কাচের পায়াযুক্ত টুলের উপরে রাখা হইয়াছে। "E" একটি বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্র, ধাতুর তার দিয়া ইহা পাত্রের সহিত যুক্ত আছে। এখন রেশমি সূতায় বাঁধা "A"-চিহ্নিত গোলকটিকে ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ করিয়া পাত্রের ভিতরে ঝুলাইয়া রাখা গেল। এই অবস্থায় তোমরা বিদ্যুৎ-দর্শকের সোনার পাতা দুটিকে স্পষ্ট তফাৎ হইতে দেখিবে। কেন তফাৎ হইবে বলা কঠিন নয়। "A"-এর ধন-বিদ্যুৎ পাত্রের ভিতরকার দেওয়ালে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করিল এবং তাহার ধন-বিদ্যুৎ তার দিয়া সোনার পাতে হাজির হইল। কাজেই, পাতা দু'টিব মধ্যে বিকর্ষণ দেখা গেল।

এখন ধাতু-গোলকটিকে পাত্র হইতে উঠাইয়া দূরে লইয়া যাও। ইহাতে কি দেখা যাইবে, তোমরা বোধ করি নিজেরাই বলিতে পারিবে। এই অবস্থায় পাত্রের ঋণ-বিদ্যুৎ আর আট্‌কাইয়া থাকিবে না। কাজেই, এই ঋণ-বিদ্যুৎ, ধন-বিদ্যুতের সহিত মিশিয়া পাত্রটিকে বিদ্যুৎ-শূন্য করিবে। ইহার ফলে সোনার পাতা

কাছাকাছি হইয়া পড়িবে। বিদ্যুৎ-যুক্ত গোলকটি পাত্রে যে ধন ও ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করে, তাহাদের পরিমাণ যে সমান, এই পরীক্ষায় তাহা প্রত্যক্ষ জানা যায়।

বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের আকারে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে কেন আনাগোনা করে, তাহার কথা তোমাদিগকে আগেই একটু বলিয়াছি। এখন যে-সব পরীক্ষার কথা বলিতেছি, তাহাতে বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝিতে
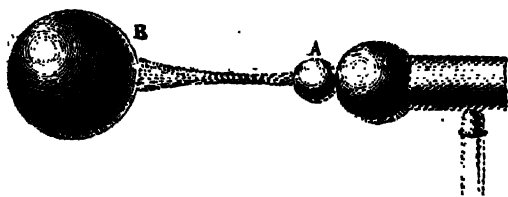
বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ

পারিবে। এখানকার ছবির "A"-চিহ্নিত অংশ বিদ্যুৎ-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ধন-বিদ্যুৎ জমিয়াছে। "B"-চিহ্নিত জিনিষটিকে তাহারি কাছে আনিলে কি হয়, বলা যায় না কি? ইহার ডাইনের প্রান্তে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ হয় এবং তার পরে "A"-এর ধন-বিদ্যুৎ "B"-এর

ঋণ-বিদ্যুতের সহিত মিশিবার জন্য পরস্পর প্রাণপণ আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ যখন খুব বেশি হয়, তখন ঐ দুই বিদ্যুৎ মাঝের বাতাসের বাধা কাটাইয়া খুব উজ্জ্বল আলোর আকারে মিলিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পট্ পট্ শব্দও হয়। ইহাই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু তোমরা কখনই মনে করিয়ো না, বিদ্যুৎ আগুনের মতো একটা জিনিষ। বিদ্যুৎকে চোখে দেখা যায় না। ইহা যখন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায়, তখন যাহার ভিতর দিয়া যায় তাহাকে গরম করে এবং উজ্জ্বল করে। তাহা হইলে দেখ, স্ফুলিঙ্গের আলো বিদ্যুতের
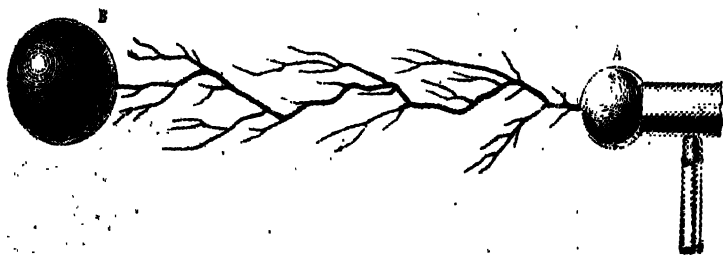
লম্বা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ

আলো নয়। পথের মাঝের বাতাস ও ধূলিকণা গরম হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তাহাতেই এই আলো হয়।

এখন উপরের ছবিখানি দেখ। এখানেও "A" এবং

"B"-কে ঠিক্ আগের মতো সাজানো হইয়াছে। কিন্তু আগে দুইয়ের মধ্যে যে-দূরত্ব ছিল, এখনকার দূরত্ব তাহার চেয়ে বেশি। ইহাতে কি হইয়াছে, ছবি দু'টি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। আগে স্ফুলিঙ্গ সোজা পথে চলিয়াছিল, এখন তাহাই বাঁকিয়া চলিয়াছে। দুই তিন ইঞ্চির তফাৎ হইলে এই রকম বাঁকা স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়।

তলাকার ছবিখানি লক্ষ্য কর। একটা মোটা

বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ

তার গায়ে লাগাইয়া বিদ্যুৎ-যন্ত্রকে চালানো হইয়াছিল। দেখ, তারের প্রান্ত দিয়া কি-রকমে বিদ্যুৎ বাহির

হইতেছে। অন্ধকার ঘরে পরীক্ষা না করিলে এ-রকমটি তোমরা দেখিতে পাইবে না। কাছে অন্য কোনো জিনিষ থাকিলে বিদ্যুৎ আগেকার মতো লাফাইয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু কাছে কিছুই নাই, তাই বাতাসকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যুৎ ঝাঁটার আকারে বাহির হইয়া যাইতেছে।

পরের ছবিখানি দেখ। কয়েকটি মোটা তারকে ঠিক্ একই দিকে বাঁকাইয়া একটা চর্‌কি তৈয়ারি করা হইয়াছে। চর্‌কি বিদ্যুৎ-যন্ত্রের উপরে লাগানো আছে। আঙুলের ঠেলা দিলে ইহা যাহাতে বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে পারে, তাহারো ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অবস্থায় চর্‌কিকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়,—তখন উহা আপনিই তাড়াতাড়ি ঘুরিতে থাকে। কেন ইহা ঘটে তোমরা বলিতে পারো কি? বাঁকানো তারের সরু মুখ দিয়া বিদ্যুৎ বাহির হইয়া তাহার কাছের বাতাসকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করে। ইহাতে বাতাস এবং
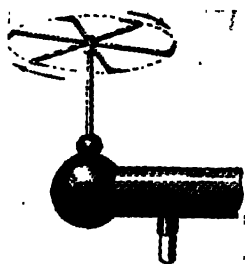
বৈদ্যুত চর্‌কি

তারের আগা একই বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া যায় এবং পরস্পর তফাতে যাইবার চেষ্টা করে। কাজেই, ইহাতে চর্কি জোরে ঘুরপাক্ দিতে থাকে। কাছের বাতাস এবং তারের আগার মধ্যে বিকর্ষণ হইয়াছে বলিয়াই চর্কিকে বাঁ হইতে ডাইন দিকে ঘুরিতে দেখা যাইতেছে।

সরু জিনিষের আগায় যে-বিদ্যুৎ জমে তাহা লইয়া আরো অনেক পরীক্ষা দেখানো যায়। এখানকার ছবিতে
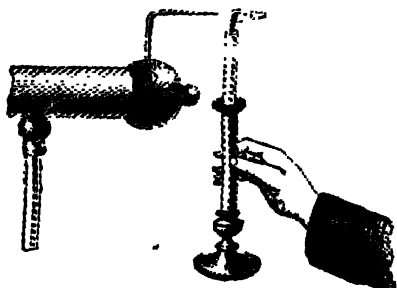
প্রদীপ-শিখার পরীক্ষা

দেখ. একটা আগা-সরু তারকে বৈদ্যুত-যন্ত্রে লাগাইয়া বিদ্যুৎযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহার ছুঁচলো আগার কাছে একটা মোম-বাতির শিখা জ্বলিতেছে। দেখ, বাতির শিখা তারের আগা হইতে দূরে যাইবার জন্য

কেমন হেলিয়া রহিয়াছে। ইহা কেন হয় বলা কঠিন নয়। তারের সরু মুখ দিয়া বিদ্যুৎ বাহির হইয়া বাতির শিখাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিয়াছে। তাই শিখা তারের কাছ হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ছুঁচলো ধাতুর দ্রব্যকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে তাহার আগা হইতে যে বাতাস দূরে চলিয়া যায়, কাছে হাত রাখিলে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন স্পষ্টই বোধ হইবে, একটা বায়ুর প্রবাহ বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষের ছুঁচ্লো মুখ হইতে বাহির হইয়া যেন দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে।
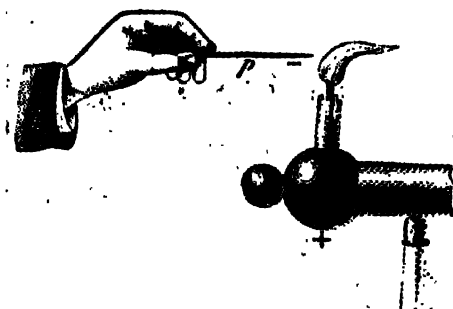
প্রদীপ-শিখাতে পরীক্ষা

উপরের ছবিতে যে পরীক্ষার বিষয় আঁকা আছে, তাহা আগেকার পরীক্ষার ঠিক্ উল্‌টা। দেখ, একটা

মোম বাতিকে জ্বালাইয়া বিদ্যুৎ-যন্ত্রে বসানো হইয়াছে এবং কাছে ছুঁচের মতো ছুঁচ্‌লো একটা কাঁটা রাখা হইয়াছে। দেখ, এখানেও বাতির শিখা হেলিয়া ছুঁচের মুখ হইতে দূরে যাইতেছে। কেন ইহা ঘটে সহজে বলা যায়। এখানে শিখার ধন-বিদ্যুৎ ছুঁচের আগায় ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার কাছের বাতাসও ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া গেল। তার পরে সেই বাতাস শিখার বিদ্যুতের সহিত মিশিবার জন্য ছুটিয়া শিখাকে হেলাইয়া দিল।

এখানে আর একটি মজার পরীক্ষার কথা বলি। তোমাদের মধ্যে কেহ কাচের পাওয়া-ওয়ালা টুলে দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎ-যন্ত্রের হাতলকে ছুঁইয়া থাকিয়ো। এমন সময়ে যন্ত্রটিকে চালাইতে থাকিলে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। মানুষের শরীর বিদ্যুতের পরিচালক। সুতরাং যন্ত্রের বিদ্যুতে মানুষটি বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়িবে,—তাহার শরীরের বিদ্যুৎ টুলের অপরিচালক কাচের পায়ার ভিতর দিয়া পলাইতে পারিবে না। কাজেই, তাহার মাথার বিদ্যুৎ-যুক্ত চুলগুলি পরস্পর তফাৎ হইবার জন্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইবে; তাহার গায়ের কাছে আঙুল রাখিলে

শরীরের বিদ্যুৎ চট্ চট্ শব্দ করিয়া স্ফুলিঙ্গাকারে তোমার আঙুলে আসিয়া লাগিবে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যাহাকে এই রকমে বিদ্যুৎ-যুক্ত করা যায়, তাহার বুঝি খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা নয়, তাহার শরীরের আগাগোড়া যে বিদ্যুৎ-পূর্ণ আছে, তাহা সে জানিতেও পারে না।

ছোটোখাটো বিদ্যুতের যন্ত্র কাছে থাকিলে এই রকমে অনেক পরীক্ষা করা যায়। যন্ত্র কাছে পাইলে তোমরা এই পরীক্ষাগুলি করিয়া দেখিয়ো।

বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক (Condensers)

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, কাঠের কাগজের বা কাচের বাক্সের ভিতরে চুম্বক রাখিলে, তাহা বাহিরের লোহাকে আকর্ষণ করে এবং তাহাতে চুম্বক-শক্তিরও আবেশ করে। কাঠ, কাগজ, কাচ এবং লোহা ছাড়া অন্য কোনো ধাতু চুম্বকের শক্তিতে বাধা দিতে পারে না। বিদ্যুতেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি, ধন-বিদ্যুৎ এবং ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ দুইটি জিনিষের মধ্যে শুষ্ক বাতাস বা অন্য অপরিচালক বস্তুর ব্যবধান থাকিলে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ একটুও কম-বেশি হয় না,— কারণ কাচ বাতাস বা অন্য কোনো অপরিচালক জিনিষ মাঝে দাঁড়াইলে বিদ্যুতের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বাধা পায় না। আবার দেখ, বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্রের কাচের আবরণের বাহিরে একটা বিদ্যুৎ-যুক্ত কাচের দাণ্ডা রাখা মাত্র যন্ত্রের সোনার পাতা বিচলিত হইয়া পড়ে। কেন ইহা ঘটে তোমরা তাহাও জানো। দাণ্ডার বিদ্যুৎ, যন্ত্রের

সোনার পাতে বিপরীত বিদ্যুতের আবেশ করে। ইহাতেই পাতা দুইটি বিচলিত হয়। কাজেই বলিতে হয়, মাঝে কাচ বা অন্য কোনো অপরিচালক জিনিষ দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের আবেশে একটুও বাধা দিতে পারে না।

দুইটা পরিচালক জিনিষের মাঝে কোনো অপরিচালক জিনিষ রাখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে দেখা গিয়াছে, যে-জিনিষ সাধারণতঃ অতি-অল্প বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখে, মাঝে কোনো অপরিচালক ব্যবধান রাখিয়া বিদ্যুতের আবেশ করিতে থাকিলে, তাহাতে অনেক বেশি বিদ্যুৎ জমা হয়। এই-রকমে ছোটো জিনিষে বেশি বিদ্যুৎ জমানো কম ব্যাপার নয়। ইহাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়। কোনো পরিচালক বস্তুতে বেশি বিদ্যুৎ জমিলে তাহা হইতে বড় বড় স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়। সেই বিদ্যুৎ তখন মাঝের ছোটোখাটো বাধাকে না মানিয়া কাছের অন্য জিনিষে লাফাইয়া আসে।

এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে একটা কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। মনে কর, আমরা একটা কলসীতে জল ভরিতে যাইতেছি। কলসীতে যেন দশ সের জল

আঁটে। আমরা জোর করিয়া তাহাতে বারো সের বা পনেরো সের জল রাখিতে পারি কি? কখনই পারি না। বেশি জল বোঝাই করিতে গেলে, জল মাটিতে গড়াইয়া পড়ে। সাধারণ পরিচালক জিনিষের অবস্থা কতকটা সেই রকম। বিদ্যুৎ-যন্ত্রে লাগাইয়া কোনো পরিচালক জিনিষে যত-খুসি বিদ্যুৎ জমানো যায় না। যেমন দশ-সেরা কলসীতে কেবল দশ সেরই জল ধরে; তেমনি প্রত্যেক পরিচালক জিনিষ এক-একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিতে পারে। তাহার বেশি বিদ্যুৎ দিলে, তাহা ঐ জিনিষে স্থান পায় না। তাহা হইলে দেখ, আয়তন অনুসারে কলসীর যেমন জল ধরিয়া রাখার সীমা আছে, তেমনি নানা পরিচালক জিনিষের বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখারও এক-একটি সীমা দেখা যায়। ইহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ধারণ-শক্তি (Capacity) নাম দিয়াছেন। কলসীকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া না গড়িলে, তাহার জল-ধারণ-শক্তিকে বাড়ানো যায় না, কিন্তু পরিচালক জিনিষের বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখার শক্তিকে ইচ্ছামতো কিছু দূর অবধি বাড়ানো চলে। কি-প্রণালীতে এই কাজটি করা হয়, তোমাদিগকে তাহাই এখন বলিব।

এখানকার ছবিটি দেখ। ইহার "A" এবং "B" অংশ দুখানি ধাতুর চাক্‌তি। ধাতু বিদ্যুতের পরিচালক; তাই সেই দুটিকে কাচের পায়ার উপরে রাখা হইয়াছে। মাঝে আছে একখানি পাতলা কাচের পর্দ্দা। "A"
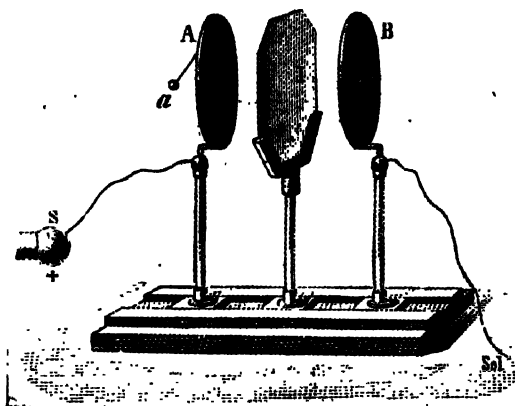
বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক

চাক্‌তিকে "S" বিদ্যুৎ-যন্ত্রের সঙ্গে তার দিয়া লাগানো হইয়াছে। আবার "B"-কে সেই রকমে মাটির সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে। মনে কর, বিদ্যুৎ-যন্ত্র হইতে যেন খানিকটা ধন-বিদ্যুৎ "A"-তে আসিয়া জমিল। এই অবস্থায় "B"-এর উপরে উহা কি কাজ করিবে

অনায়াসেই বলা যায়। "A"-এর ধন-বিদ্যুৎ "B"-এর বাঁ দিকে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করিয়া আট্‌কাইয়া রাখিবে এবং তাহার ধন-বিদ্যুৎটুকু তার দিয়া মাটিতে চলিয়া যাইবে। কেবল ইহাই নয়, "A"-র সর্ব্বাঙ্গে যে-ধন-বিদ্যুৎ ছড়াইয়াছিল, তাহা "B"-এর ঋণ-বিদ্যুতের টানে উহার ডাইন ধারে আসিয়া জমা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে "A"-এর বাঁ ধারটা প্রায় বিদ্যুৎ-শূন্য হইয়া পড়িবে। বিদ্যুৎ-যন্ত্রের সঙ্গে "A" সংযুক্ত আছে। কাজেই, যন্ত্রের বিদ্যুৎ "A"-এর বাঁ ধারে আসিয়া তাহাকে আবার বিদ্যুৎ-যুক্ত করিবে। সুতরাং বলিতে হয়, যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ আগে "A" ধরিয়া রাখিয়াছিল, কাছে আর একটা পরিচালক জিনিষ থাকায় এখন তাহাই অনেক বেশি বিদ্যুৎ ধরিয়া রাখিতেছে। "A" এবং "B"-কে আরো কাছাকাছি আনিয়া মাঝের কাচের গায়ে লাগাইয়া পরীক্ষা কর; দেখিবে, এখন "A"এর ধারণ-শক্তি আরো বাড়িয়া গিয়াছে। এই রকম পরীক্ষায় কখনো কখনো "A"-তে এত বিদ্যুৎ জমে যে, তাহা মাঝের কাচটিকে ফাটাইয়া "B"-এর বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিয়া যায়। একটি রেশম-মোড়া তারের এক প্রান্ত "A"-তে ছোঁয়াইয়া অন্য প্রান্ত "B"-এর

কাছে আনিলে বিদ্যুতের মোটা স্ফুলিঙ্গ "A" হইতে "B"-এ লাফাইয়া পড়ে।

আমরা দুইখানি পরিচালক চাক্‌তির মধ্যে কাচের পর্দ্দা রাখিয়া পরীক্ষা করিলাম। তোমরা কাচের বদলে এবোনাইট্ গন্ধক বা অন্য কোনো অপরিচালক জিনিষকে মাঝে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো। ইহাতেও "A"-এর ধারণ-শক্তিকে বাড়িতে দেখিবে। বাতাস বিদ্যুৎ পরিচালনে বাধা দেয়। দুই চাক্‌তির মাঝে বাতাসের ব্যবধান রাখিয়াও এই পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু বাতাস বেশি বিদ্যুৎকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না। এইজন্য চাক্‌তিতে কিছু বিদ্যুৎ জমিলেই তাহা বাতাস ভেদ করিয়া পরস্পর মিলিয়া যায়। বিদ্যুৎ-যন্ত্রের কাছে আঙুল রাখিলে আঙুলে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ আসিয়া ঠেকে। ইহাকেও বিদ্যুৎ-সংগ্রাহকের কাজ বলা যাইতে পারে। আঙুলের ডগায় যন্ত্রের বিদ্যুৎ যে বিদ্যুৎটুকুর আবেশ করে, তাহা দ্বারা যন্ত্রের যে-অংশ আঙুলের সম্মুখে থাকে, তাহাতে বেশি বিদ্যুৎ জমা হয়। তার পরে সেই বিদ্যুৎই স্ফুলিঙ্গাকারে আঙুলে লাগে। এই অবস্থায় মাঝের বাতাস বিদ্যুৎকে বাধা দিতে পারে না।

যাহা হউক, যে-যন্ত্র দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোনো জিনিষের বিদ্যুৎ-ধারণ-শক্তিকে বাড়ানো যায়, তাহাকেই বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্র বলা হয়। আজকাল বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোন্ যন্ত্রের অনেক কাজ চলিতেছে। এজন্য বিষয়টা জানিয়া রাখা দরকার।

এ-পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, কোনো পরিচালক জিনিষে বিদ্যুৎ জমাইতে গেলে বিদ্যুতের পরিমাণ অনেক ব্যাপারের উপরে নির্ভর করে। জিনিষটি আকারে যত বড় হয়, তাহাতে তত বেশি বিদ্যুৎ জমে। পূর্ব্ব-পরীক্ষায় "A"-এবং, "B"-এর মধ্যেকার ফাঁক যত কম হয়, ততই বেশি বিদ্যুৎ একত্র হয়। যে রোধক বস্তু (Dielectric) দুইয়ের মাঝে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার উপরেও "A" এবং "B"-এর বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বাতাসকে রোধক-বস্তু করিয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিতে গেলে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ জমে, এবোনাইট্ বা প্যারাফিন্‌কে রোধক করিলে তাহার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ জমানো যায়। আবার সকলের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ জমে যখন কাচ রোধক হইয়া মাঝে দাঁড়ায়। তাহা হইলে

দেখ, কোনো জিনিষের বিদ্যুৎ-ধারণ-শক্তি বাড়াইতে গেলে, অনেক বিষয়ের উপরে নজর রাখিতে হয়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, যে বেশি অপরিচালক, তাহাকে রোধক-বস্তু করিয়া মাঝে দাঁড় করাইলে বেশি বিদ্যুৎ জমানো যাইবে। কিন্তু তাহা নয়। এবোনাইট্ ও প্যারাফিন্ কাচের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রোধক। অর্থাৎ কাচ যে-রকমে রোধকের কাজ চালায়, ইবোনাইট্ ও প্যারাফিন্ তাহা পারে না। পরীক্ষা করিলে জানা যায়, বিদ্যুৎ-সংগ্রহ-ব্যাপারে রোধকের কাজ সামান্য নয়। এ-পাশে এবং ওপাশে যে-বিদ্যুৎ থাকে তাহা রোধকের অণুগুলিকে টানাটানি করিয়া বিকৃত করিয়া দেয়। যে-বস্তু ভালো রোধক তাহা এই টানাটানিতে হার না মানিয়া দুই বিদ্যুৎকে অনেকক্ষণ তফাতে রাখে। তার পরে যেই টানের সীমা চরমে উঠে, অমনি দুই পাশের বিদ্যুৎ রোধকের বাধা ভেদ করিয়া পরস্পর একত্র হয়।

লীডেন্ জার্

লীডেন জার (Leyden Jar) আর এক রকম বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্র। যন্ত্রের এই বিদেশী নামটি বদ্‌লানো উচিত নয়, কারণ ইহার সঙ্গে একটি সুন্দর ইতিহাস জড়ানো আছে। প্রায় দুই শত বৎসর আগে হল্যাণ্ড দেশের লীডেন্ সহরে কুনিয়স্ (Cunaes) নামে কোনো একটি ছাত্র বিদ্যুৎ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটা কাচের পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া সেই জলটাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি পাত্রটিকে ডান হাতে ধরিয়া রাখিলেন। বিদ্যুৎ-যন্ত্র চালানো হইল। যন্ত্রের বিদ্যুৎ একটা লোহার পেরেকের ভিতর দিয়া জলে আসিয়া জলকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিল। কিন্তু পাত্রটিকে মাটিতে নামাইবার সময়ে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। এক হাতে এত-বড় পাত্রটাকে নামানো যায় না। তাই পাত্রটিকে ধরিবার জন্য বাঁ হাতখানিকে যেই পেরেকের কাছে আনা হইল, অমনি একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ আসিয়া

তাঁহার হাতে আঘাত দিল। সকলে অবাক্। সে-সময়ে এখনকার মত ভালো বৈদ্যুত যন্ত্র ছিল না। তখন গন্ধককে পশম ঘষিয়া কোনো রকমে একটু-আধ্টু বিদ্যুৎ তৈয়ারি করা হইত এবং তাহা লইয়াই কষ্টে পরীক্ষা চলিত। তোমরা বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্রে যেমন অতি-অল্প স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাও, তখন তাহার বেশি বিদ্যুৎ কোনো রকমেই পাওয়া যাইত না। এত বিদ্যুৎ কেমন করিয়া জমা হইল, সকলে তাহারি সন্ধান করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, কুনিয়স্ যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গে আঘাত পাইয়াছেন, এই খবরটা দেখিতে দেখিতে তাঁহার গুরু মুসেন্‌ব্রোকের (Muchenbroeck) কানে গেল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া সব কথা শুনিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না। শিষ্য যেমন করিয়া কাচের পাত্রটিকে ধরিয়া জলে বিদ্যুৎ চালাইয়াছিলেন, গুরু নিজের হাতে ঠিক্ সেই রকমে পরীক্ষা করিতে গেলেন। বিদ্যুৎ-যন্ত্র চলিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে বিদ্যুৎ জমিল। তার পরে জলে-ডুবানো পেরেকের কাছে আঙুল দিবা মাত্র, গুরুর হাতে এক প্রকাণ্ড বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ আসিয়া লাগিল। এত প্রচণ্ড

বিদ্যুতের আঘাত বুড়া মানুষের সহ্য হইবে কেন? তিনি সেই আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং তিন দিন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না।

এই রকম ঘটনার কথার প্রচার হইতে দেরি হয় না। ইহার খবর যখন আমেরিকা ও য়ুরোপে পৌঁছিল, তখন পণ্ডিত-মহলে এক হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অনেকে পরীক্ষাগারে বসিয়া বিষয়টি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিয়াছিলেন। ইহার ফল কি হইয়াছিল, তোমরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছ। আমরা আজকাল যেমন বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্রের একটা চাক্তিতে অপর চাক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ জমা করি, কাচের পাত্রের জলে ঠিক্ সেই রকমেই বেশি বিদ্যুৎ জমিয়াছিল। হাত দিয়া পাত্রটি ধরা ছিল। তাই হাত ও জল বিদ্যুৎ-সংগ্রাহকের দুইটি চাক্তির মতো কাজ করিয়াছিল এবং পাত্রের কাচ মাঝে দাঁড়াইয়া রোধকের কাজ করিয়াছিল। ইহাতে জলের বিদ্যুৎ-ধারণ-শক্তি বাড়িয়া যাইবার কথা নয় কি? তোমরা হয় তো ভাবিতেছ, সেকালের বড় বড় পণ্ডিতেরা এই অতি-সহজ ব্যাপারটিকে বুঝিতে পারেন নাই কেন? বোঁটা ছিঁড়িয়া গেলে পাকা ফল যে মাটিতে পড়ে, তাহা লক্ষ

লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ দেখিয়া আসিতেছিল। বেশি দিন নয়, আড়াই শত বৎসর আগে মহাপণ্ডিত নিউটন সেই তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া যে মহৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি তোমরা জানো। এই রকমেই এক-এক জন পণ্ডিত তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের সীমাকে বাড়াইয়া যাইতেছেন। জ্ঞান-লাভ এবং সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখা এক দিনে এক জনকে দিয়া হয় না। যাহা হউক, পূর্ব্বের আবিষ্কারটির পরে লীডেন্ জার তৈয়ারির কৌশল জানা গিয়াছিল। হল্যাণ্ডের লীডেন্ সহরে ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল বলিয়া যন্ত্রের নাম লীডেন্ জার হইয়াছে।

পরপৃষ্ঠায় লীডেন্ জারের একটি ছবি দিলাম। যন্ত্রটি বিশেষ কিছুই নয়। দেখ, একটা বড়-মুখ-ওয়ালা কাচের বোতলের ভিতর এবং বাহিরের কিছু দূর পর্য্যন্ত রাঙের পাত দিয়া মোড়া হইয়াছে। বোতলের মুখে গালার প্রলেপ দেওয়া একটা কাঠ বা কর্ক লাগানো আছে। তার পরে পিতল বা তামার একটা দাণ্ডা কর্কের ভিতর দিয়া বোতলের তলাকার রাঙের পাতে ঠেকিয়াছে। দেখ, ডাণ্ডার বিদ্যুৎ যাহাতে না পলাইয়া

যায়, তাহার জন্য উহার আগাটায় একটা পিতলের বল্ লাগানো আছে। ইহাই লীডেন্ জার। বড়-মুখ-ওয়ালা একটা কুইনিনের শিশির ভিতর-বাহির ঐরকমে রাঙ মুড়িয়া তোমরা অনায়াসেই লীডেন্ জার তৈয়ারি করিতে পারিবে। রাঙ্ মুড়িবার সময়ে গলার কাছ হইতে নীচের দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণে ফাঁক রাখিয়ো। আমরা এই রকমে অনেক ছোটো লীডেন্ জার তৈয়ারি করিয়াছি।

লীডেন্ জার

লীডেন জার দিয়া কি কাজ পাওয়া যায়, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। ইহা এক রকম বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। শিশির ভিতর ও বাহিরের রাঙের পাত সেই আগেকার পরীক্ষার

ধাতুর চাক্তির মতো কাজ করে। তাই এখানকার ছবির মতো শিশির ভিতরকার রাঙ বিদ্যুৎ-যুক্ত করিলে উহার বিদ্যুৎধারণ-শক্তি বাড়িয়া যায়। কেন বাড়ে, তাহা আগের পরীক্ষার কথা মনে থাকিলে তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। বৈদ্যুত যন্ত্র
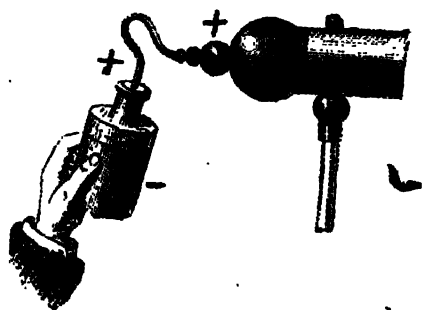
হইতে সাধারণতঃ ধন-বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। মনে কর, শিশিকে হাতে রাখিয়া সেই ধন-বিদ্যুতে যেন তাহার ভিতরকার রাঙের পর্দ্দাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করা গেল। এখন বাহিরের পর্দ্দার অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? ভিতরের ধন-বিদ্যুতে বাহিরের রাঙের পর্দ্দার ভিতরকার পিঠে ঋণ-বিদ্যুৎ এবং বাহিরের পিঠে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ হইবে। শিশির ভিতর পিঠের

ধন-বিদ্যুৎ বাহির পিঠের ঋণ-বিদ্যুৎকে টানিয়া আট্‌কাইয়া রাখিবে,—মুক্ত থাকিবে কেবল বাহিরের পর্দ্দার ধন-বিদ্যুৎ। কিন্তু আমাদের হাত বাহিরের পর্দ্দাকে ছুঁইয়া আছে। কাজেই, উহাতে যে মুক্ত ধন-বিদ্যুৎ টুকু জমিল, তাহা আমাদের শরীরের ভিতর দিয়া মাটিতে চলিয়া যাইবে। লীডেন্ জারে এই রকমেই শিশির বাহিরের ঋণ-বিদ্যুৎ এবং ভিতরকার ধন-বিদ্যুৎ পরস্পরকে টানিয়া ক্রমেই পরিমাণে বেশি হইয়া দাঁড়ায়।

লীডেন্ জারের দুই পিঠে এই রকমে যে ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুৎ জমা হয়, পরিমাণে বেশি হইলে তাহা মোটা স্ফুলিঙ্গের আকারে পরস্পর মিলিয়া যায়। বাতাস ভেদ করিয়া মিলিবার সময়ে যে-আলোড়ন হয় তাহাতে পট্ পট্ শব্দও শুনা যায়। কিন্তু লীডেন্ জারের দুই পিঠের বিদ্যুৎকে একত্র করা বড় মুস্কিল। তাই ভিতর ও বাহির পিঠের বিদ্যুৎকে মিলাইবার জন্য বেড়ির মতো মিলক-যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পরপৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, কাচের-হাতল-ওয়ালা সেই মিলক-যন্ত্রের একটা শাখাকে লীডেন জারের বাহিরের পর্দ্দায় ঠেকাইয়া অন্য শাখাকে জারের ভিতরকার ডাণ্ডার কাছে

ধরা হইয়াছে। ইহাতে দুই বিদ্যুৎ কি-রকমে মিলিত হইয়াছে, তাহা ছবিতে আঁকিয়া দিয়াছি। এক হাতে লীডেন্ জারের বাহিরের পর্দ্দাকে ছুঁইয়া অন্য হাতের আঙুল ডাণ্ডার মাথার গোলার কাছে আনিলেও দুই বিদ্যুৎকে মিলিতে দেখা যায়। কিন্তু এই পরীক্ষায় বিপদ
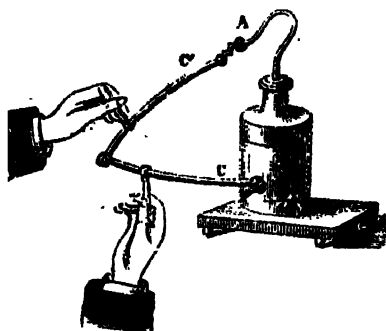
মিলকের ব্যবহার

আছে। যখন দুই বিদ্যুৎ মোটা স্ফুলিঙ্গের আকারে আঙুলে ঠেকে, তখন এমন ঝাঁকুনি লাগে যে, তাহাতে যেন হাড়গুলা গুঁড়া হইয়া যায়। তোমরা যখন লীডেন্ জার লইয়া পরীক্ষা করিবে, তখন তাহার বাহিরের পর্দ্দাকে ছুঁইয়া অসাবধানে ডাণ্ডার কাছে হাত আনিয়ো না।

লীডেন্ জারের বিদ্যুৎকে মিলক দিয়া মিলানো ছাড়া ধীরে ধীরে মিলানো চলে। জারকে বিদ্যুৎযুক্ত

করিয়া এক টুকরা কাচ বা এবোনাইটের উপরে রাখো। তার পরে তাহার ডাণ্ডার কাছে আঙুল লইয়া যাও। দেখিবে, বিদ্যুতের একটা ছোটো স্ফুলিঙ্গ পুট্ করিয়া আঙুলে লাগিতেছে। তার পরে আবার আঙুলটিকে বাহিরের পর্দ্দার কাছে রাখো। এখনও দেখিবে, সেই রকম স্ফুলিঙ্গ আঙুলে ঠেকিতেছে। এই রকমে একবার ডাণ্ডার আগায়, এবং আর একবার বাহিরের পর্দ্দার কাছে বার বার আঙুল লইয়া গিয়া দুই বিদ্যুৎকে ধীরে ধীরে মিলানো যায়।

লীডেন্ জার তৈয়ারি করা সহজ, কিন্তু তাহাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত করিতে গেলে ছোটো-খাটো বৈদ্যুত যন্ত্রের দরকার। তোমরা যখন কাছে বৈদ্যুত যন্ত্র পাইবে, তখন লীডেন্ জারের পরীক্ষাগুলি করিয়ো।

লীডেন্ জারের ব্যাটারি

তোমরা আগেই দেখিয়াছ, বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্রের দুই পাশের ধাতুর চাক্‌তি যত বড় হয় এবং মাঝের রোধক জিনিষটির শক্তি যত প্রবল হয়, চাক্‌তির ধারণ-শক্তি ততই বাড়িয়া চলে। লীডেন্ জার্ এক প্রকার বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ইহার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। অর্থাৎ ইহার শিশিটাকে যত বড় করা যায়, তাহাতে ততই বেশি বিদ্যুৎ জমার সম্ভাবনা থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া ঠিক্ ইহাই দেখিয়াছেন। কিন্তু শিশিকে বড় করার হাঙ্গামা অনেক। তাই তাঁহারা একটার বদলে দশ-বিশটা জার একত্র করিয়া বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকেন।

পরপৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, নয়টা ছোটো জার এক সঙ্গে রাখা হইয়াছে। এই রকমে একটা খুব বড় জারের মতো কাজ পাওয়া যায়। ইহাকেই বলে লীডেন জারের ব্যাটারি। যে-বাক্সে জারগুলি সাজানো আছে, তাহার ভিতরটা কোনো রকম ধাতুর পাতে

মোড়া থাকে। আবার সেই পাতকে T-চিহ্নিত শিকল দিয়া মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়। কাজেই, সব জারের বাহিরের পর্দ্দা পরস্পর এক-যোগে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তার পরে দেখ, জারগুলির ভিতরের পর্দ্দা
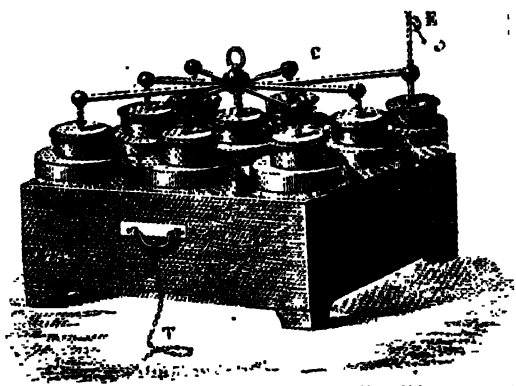
সীডেন্ জারের ব্যাটারি

পিতলের বা অন্য কোনো ধাতুর ডাণ্ডা দিয়া পরস্পর সংযুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার C-চিহ্নিত জায়গায় যখন বৈদ্যুত যন্ত্র ছোঁয়ানো যায়, তখন সব জারই এক সঙ্গে বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়ে। তার পরে মেলক-যন্ত্রের এক শাখাকে শিকলের গায়ে ঠেকাইয়া, অন্য শাখাকে জারের উপরকার কোনো জায়গায় ধরিলে

প্রকাণ্ড স্ফুলিঙ্গের আকারে ভিতর ও বাহিরের পর্দ্দার বিদ্যুৎ মিলিয়া যায়।

নীচের ছবিখানি লক্ষ্য কর। ব্যাপারটি বিশেষ কিছুই নয়। "S" একটা কাচের গ্লাস, "D" জিনিষটা

লীডেন্ জারের বিভিন্ন অংশ

ধাতু দিয়া গ্লাসের আকারে তৈয়ারি। এখন "C"-এর ভিতরে "S"কে বসাইয়া এবং তাহার ভিতরে D-কে বসাইলে যন্ত্রটি যে-রকম হয় তাহার ছবির "B"-চিহ্নিত অংশে আঁকা আছে। ইহা এক রকম লীডেন্ জার হইল না কি? D এবং C হইল জারের ভিতর-কার ও বাহিরের পর্দ্দা, এবং S হইল মাঝের রোধক বস্তু। এখন যদি এই রকমে সাজাইয়া জারটিকে সাধারণ লীডেন্ জারের মতো বিদ্যুৎ-যুক্ত কর, তাহা

হইলে উহার ভিতরকার ও বাহিরের অংশে বিদ্যুৎ জমা হইবে। কেবল ইহাই নয়, মেলক বেড়ি দিয়া ভিতর ও বাহিরকে-যোগ করিলে স্ফুলিঙ্গও দেখা দিবে।

মনে কর, বিদ্যুৎ-যুক্ত করার পরে আমরা যেন জারের ভিতরকার পর্দ্দা D-কে ধীরে ধীরে উঠাইয়া দূরে রাখিলাম। তার পরে কাচের গ্লাস "S"কে উঠাইলাম। সুতরাং আগে যে-তিনটা অংশকে জুড়িয়া লীডেন্ জার্ প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন সেই তিনটি পৃথক্ হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় "C" এবং "D"-এ বিদ্যুৎ থাকিতে পারে কি? কাছে আঙ্গুল রাখিয়া, বিদ্যুৎ-দর্শকে পরীক্ষা করিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া যে-রকমে পারো পরীক্ষা কর। ইহাতে "C" এবং "D"-তে একটুও বিদ্যুতের লক্ষণ দেখিতে পাইবে না। কেবল ইহাই নয়, "S"-এর কাচেও বিদ্যুৎ দেখা যাইবে না। জারটিকে আবার আগের মতো সাজাও। অর্থাৎ "C"-এর ভিতরে "S"-কে এবং তাহার ভিতরে "D"-কে বসাও। এই অবস্থায় সেই মেলক বেড়ি দিয়া জারের বাহিরের পিঠের সঙ্গে ভিতরকার পিঠ যোগ করিতে গেলেই মোটা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? পরীক্ষা করায় তাহার

বাহিরের এবং ভিতরকার পর্দ্দায় একটুও বিদ্যুৎ দেখা যায় নাই ; মাঝে কাচের গ্লাসেও বিদ্যুৎ ছিল না। তবে এই বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ আসিল কোথা হইতে ?

এই প্রশ্নের যাহা উত্তর, তাহার আভাস আগেই দিয়াছি। লীডেন্ জার্ বা অপর কোনো সংগ্রাহক যন্ত্রের বিদ্যুৎ তাহার দুই পর্দ্দায় জমিয়া স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে না। পর্দ্দা দুইটি বিদ্যুৎকে কেবল কাচের ভিতরে চালান করে। ইহাতে কাচের অণুগুলিতে যে টান্ পড়ে, তাহাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এই টান্ সহজে যাইতে চাহে না। তাই পর্দ্দাগুলিকে পৃথক্ করায় স্ফুলিঙ্গ পাওয়া গেল।

তোমরা বোধ করি লক্ষ্য কর নাই, লীডেন্ জারের দুই পর্দ্দাকে সংযুক্ত করিলে তাহার সমস্ত বিদ্যুৎ নিঃশেষে মিলিয়া যায় না। একটা সাধারণ জার্কে বিদ্যুৎ-যুক্ত কর এবং তার পরে মেলক দিয়া তাহার বিদ্যুৎ মিলাইয়া দাও। বড় স্ফুলিঙ্গের আকারে দুই পর্দ্দার বিদ্যুৎ মিলিয়া যাইবে। মনে হয় বুঝি জারের সমস্ত বিদ্যুৎই মিলিয়া গেল। কিন্তু তাহা নয়। এখন মেলকের এক শাখাকে বাহিরের পর্দ্দায় লাগাইয়া অন্য শাখাকে ভিতরের পর্দ্দার কাছে আনো। দেখিবে,

আবার একটা ছোটো স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। এই রকমে একই জার হইতে পরে পরে দুই তিন বা তাহারো বেশি স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়। এই বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসে, জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, দুই পর্দ্দার বিদ্যুতে মাঝের কাচের অণুতে যে টান পড়ে প্রথম-বারের স্ফুলিঙ্গে তাহা একবারে লোপ পায় না। সেই টানের যাহা বাকি থাকে, তাহাই পরে ছোটো-ছোটো স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে। তাহা হইলে দেখ, টানের মাঝে পড়িয়া কাচের অণুই যে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের সাহায্য করে, তাহার আর একটা প্রমাণ এখানে পাওয়া গেল।

পরপৃষ্ঠায় আর একটি ছবি দিলাম। ইহা কিসের ছবি, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। এটাও এক রকম বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক। ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। দেখ, ছবিতে “a” “a” ইত্যাদি পাঁচখানা এবং “b” “b” ইত্যাদি আরো পাঁচখানা পাত্‌লা তামার বা রাঙের পাত রহিয়াছে। তাহাদের মাঝে খুব পাত্‌লা অভ্র বা কাচের ফলক আছে। অর্থাৎ ধাতু-ফলকের নীচে কাচ অভ্র বা অন্য কোনো অপরিচালক জিনিষের পর্দ্দা রহিয়াছে। ছবিতে দেখ, “a” “a”-চিহ্নিত ধাতুর

ফলকগুলি "A"-চিহ্নিত পরিচালক গোলকের সঙ্গে যুক্ত আছে ; এবং "b" "b"-চিহ্নিত ফলকগুলি সেই রকমে "B"-এর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। কাজেই, ইহাতে সমস্ত যন্ত্রটি একটা বড় বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যন্ত্রকে বিদ্যুৎ যুক্ত করিলে
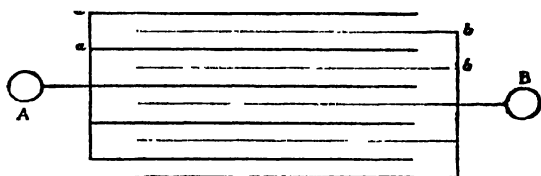
বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক যন্ত্র

খুব বড় স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়। বেতার টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন্ যন্ত্রে আজকাল এই রকম সংগ্রাহক ব্যবহৃত হয়। ধাতু-ফলকগুলি খণ্ডিত অবস্থায় আছে বলিয়া প্রয়োজন-মতো দুইটা চারিটা বা দশটা ফলককে জুড়িয়া সংগ্রাহকের শক্তি বাড়ানো কমানো চলে। দেখ, ইহার তৈয়ারিতে বিশেষ হাঙ্গামা করিতে হয় না,—লীডেন্ জারের মতো ইহা অনেকটা জায়গা জুড়িয়াও থাকে না।

বৈদ্যুতিক আন্দোলন

যখন লীডেন্ জারের বাহিরের পর্দ্দাকে মেলক দিয়া ভিতরের পর্দ্দার সঙ্গে একত্র করিতে যাওয়া হয়, তখন খুব মোটা স্ফুলিঙ্গ নজরে পড়ে। দেখিলে মনে হয়, বুঝি ইহা একটামাত্র স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ইহারি ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, যেমন একটা মোটা পাটের দড়িতে হাজার-হাজার পাটের আঁশ থাকে, তেমনি লীডেন্ জারের এক-একটা স্ফুলিঙ্গ হাজার দু-হাজার ছোটো স্ফুলিঙ্গ মিলিয়া উৎপন্ন করে। স্ফুলিঙ্গ সাধারণতঃ ধন-বিদ্যুৎ হইতে ঋণ-বিদ্যুতে গিয়া মিলে। কিন্তু লীডেন্ জারের ছোটো স্ফুলিঙ্গগুলি ধন হইতে ঋণে এবং ঋণ হইতে ধনে বার-বার যাওয়া-আসা করে। অর্থাৎ ঘড়ির পেণ্ডুলম্ যেমন ডাইন হইতে বাঁয়ে এবং বাঁ হইতে ডাইনে দুলিয়া বেড়ায়, লীডেন্ জারের স্ফুলিঙ্গও সেই রকমে দুলিয়া চলে। স্ফুলিঙ্গে এই রকম দুলিয়া চলাকে বৈদ্যুতিক আন্দোলন (Electrical Oscillation) বলা হয়। ঘড়ির পেণ্ডুলমের আন্দোলন, অতি ধীরে

হয়, তাই আমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাই। বিদ্যুতের আন্দোলন সেকেণ্ডে বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বা তাহারো অধিক বার হয়। সেই জন্য তাহা আমাদের নজরে পড়ে না,—নজরে পড়ে শুধু একটা দড়ির মতো মোটা স্ফুলিঙ্গ।

প্রায় সত্তর বৎসর আগে ফেডারসন্ (Fedderson) নামে একজন বৈজ্ঞানিক একখানা আয়নাকে অবিরাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার উপরে লীডেন্ জারের স্ফুলিঙ্গের প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছিলেন। এই প্রতিবিম্বে স্ফুলিঙ্গের আন্দোলন স্পষ্ট জানা গিয়াছিল। আজকাল-কার ফোটোগ্রাফের ছবিতেও ইহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। কেবল লীডেন্ জারের স্ফুলিঙ্গেই যে বৈদ্যুতিক আন্দোলন দেখা যায়, তাহা নয়। আকাশে মেঘে-মেঘে যে বিদ্যুতের স্ফুরণ দেখা যায়, তাহাতেও বৈদ্যুতিক আন্দোলন ধরা পড়ে।

ঋণ-বিদ্যুতের সহিত মিলিবার সময়ে ধন-বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে। কিন্তু লীডেন্ জারের স্ফুলিঙ্গের বিদ্যুৎ ক্রমাগত ধন হইতে ঋণে এবং ঋণ হইতে ধনে যাওয়া-আসা করে কেন, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যখন ভিতর-পিঠের

ধন-বিদ্যুৎ জোরে বাহির হইয়া বাহির-পিঠের ঋণ-বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিতে থাকে, তখন ঝোঁকের মাথায় বেশি ধন-বিদ্যুৎ বাহির-পিঠে লইয়া যায়। কাজেই, এই অবস্থায় বাহিরের পিঠ ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে। তারপরে সেই ধন-বিদ্যুৎই বাহির হইতে ভিতরের দিকে গিয়া, স্ফুলিঙ্গ দেখাইতে থাকে। এই রকমেই ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে বিদ্যুতের আন্দোলন চলে।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা কথাটা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবে। মনে কর, দুই-মুখ-খোলা ইংরেজি "U" অক্ষরের মতো বাঁকানো নলে যেন খানিকটা জল রাখা গেল। মুখ খোলা আছে, কাজেই উহার দুই শাখার জল একই সমতলে থাকিবে। এখন মনে কর, নলের ডাইনের শাখার মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া বাঁ শাখার খালি অংশে খানিকটা জল ঢালা গেল। এই অবস্থায় দুই শাখার জলের উচ্চতা কি-রকম হইবে বলা যায় না কি? ডাহিনের নলের মুখ আঙ্গুলে আটকানো আছে। কাজেই, ভিতরকার বাতাসের চাপে তাহাতে বেশি জল প্রবেশ করিবে না, —জল বেশি থাকিবে বাঁ দিকের শাখায়। এই রকমে

বাঁ শাখার জল ডাইন শাখার জলের চেয়ে বেশি উঁচু হইয়া দাঁড়াইবে। এখন মনে কর, চট্ করিয়া যেন ডাইনের শাখার মুখ খুলিয়া দেওয়া গেল। তরল জিনিষ মাত্রেই এক সমতলে থাকিবার চেষ্টা করে। কাজেই বাঁ-শাখার জল জোরে ডাইনের শাখায় আসিয়া ঠিক্ এক সমতলে দাঁড়াইবে। কিন্তু হঠাৎ এক সমতলে আসিবে না। জলটুকু দুই শাখায় অনেকবার উপরে-নীচে দোল খাইয়া শেষে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। ধন-বিদ্যুৎ যখন ঋণ-বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিবার জন্য ছুটিয়া আসে, তখন ঐ নলের দুই শাখার জলের মতোই দোল খায়। এই দোলনই বৈদ্যুতিক আন্দোলন।

বৈদ্যুতিক আন্দোলনের সাহায্যে আজকাল বেতার টেলিগ্রাফের কাজ চালানো হইতেছে। তাই এইজন্য তোমাদিগকে ইহার কথা বলিলাম।

আকাশের বিদ্যুৎ

বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়াইয়া কি-রকমে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনিয়াছিলেন, তাহার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। আমরা ঘরে বসিয়া যে-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, তাহার সঙ্গে আকাশের বিদ্যুতের একটুও তফাৎ নাই। বিদ্যুতের সঙ্গে বিদ্যুতের যে-আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ আমরা পরীক্ষাগারে দেখি, মেঘের বিদ্যুতেও তাহা দেখা যায়। বৈদ্যুৎ-যন্ত্রের কাছে আঙ্গুল রাখিলে বা লীডেন্ জারের দুই পিঠ ছুঁইতে গেলে যে-স্ফুলিঙ্গ হয়, মেঘে-মেঘে যে-বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়ায় তাহাও সেই রকমেরই স্ফুলিঙ্গ।

মনে কর, আকাশের একখানা মেঘ কোনো কারণে ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তাহার কাছের মেঘের অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষের কাছে কোনো পরিচালক বস্তু রাখিলে তাহার একদিকে বিপরীত বিদ্যুতে আবেশ হয়। ইহা তোমরা আগে অনেক পরীক্ষায় দেখিয়াছ। কাজেই, ধন-বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ নিকটের অন্য মেঘে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করিবে।

তার পরে এই দুই বিদ্যুতের শক্তি প্রবল হইয়া পড়িলে, তাহারা মাঝের বাতাসের বাধা ভেদ করিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবে। ইহাই মেঘের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ।

মেঘে মেঘে যে বিদ্যুৎ চম্‌কায় তাহার আকৃতি নানা রকম হইতে দেখা যায়। তোমরা ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। বৈশাখ মাসের বিকালে আকাশের ঈশান কোণে যে ঝোড়ো-মেঘ জমে তাহার বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে যেন সোজা পথে নীচে নামে। যখন বিদ্যুতের জোর বেশি থাকে, কেবল তখনই মেঘের বিদ্যুৎকে এই রকমে নামিতে দেখা যায়। ঘাসের শিকড় যেমন আঁকিয়া-বাঁকিয়া মাটির তলায় চলাফেরা করে, অনেক সময়ে বিদ্যুৎকে ঠিক্ সেই রকম পথে মেঘের গায়ে চলিতে দেখা যায়। পরপৃষ্ঠার ছবি-খানিতে আমরা সেইরকমের স্ফুরণ আঁকিয়া দিয়াছি। এবারে যখন মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌কাইবে, তখন লক্ষ্য করিলে এই রকম স্ফুরণ তোমরা অনেক দেখিতে পাইবে। সোজা পথ ছাড়িয়া বিদ্যুৎ কেন বাঁকা পথে চলে, তাহা আন্দাজ করা কঠিন নয়। বর্ষার দিনে মাঠে যে বৃষ্টির জল জমে, সব জায়গায় তাহা সোজা পথ ধরিয়া চলে না। যেখানকার মাটি শক্ত সেদিকে

না গিয়া জল নরম মাটিকে কাটিয়া নিজের পথ নিজেই করিয়া লয়। তাই জলকে মাঠের উপর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিতে দেখা যায়। বিদ্যুতের বাঁকা পথ এই রকম কোনো কারণেই হয়। পথের মাঝে ধূলার কণা
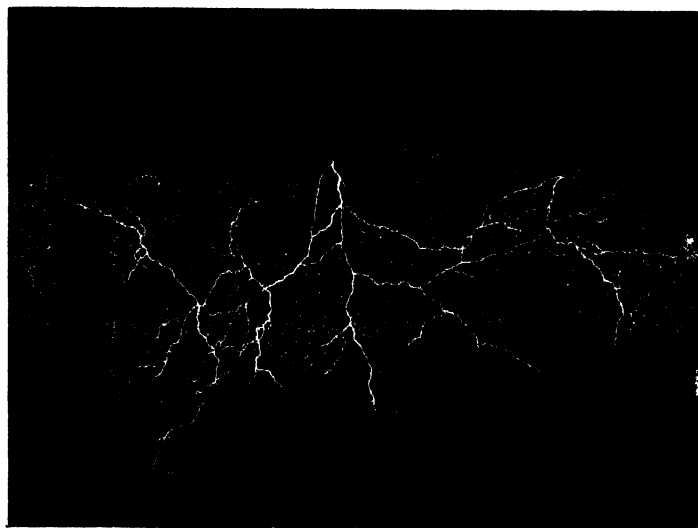
মেঘে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ

বা অন্য কোন জিনিষের বাধা পাইলেই বিদ্যুৎ মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইহাতেই তাহার পথ বাঁকা হইয়া যায়। বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছে না, অথচ হঠাৎ আকাশের কোণের একখানা বড় মেঘ

আলোকিত হইয়া পড়িল,—এই রকমের বিদ্যুৎ-স্ফুরণও অনেক সময়ে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, একই মেঘের ভিতরকার এক দিকের বিদ্যুৎ যখন অন্য দিকের বিদ্যুতের সহিত মিলিতে যায়, তখন ঐ-রকমে সমস্ত মেঘখানা আলোকিত হয়।

আকাশে যে-বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ চলিয়া বেড়ায়, তাহার রঙ্ সব সময়ে এক থাকে না। কখনো ফিট্ সাদা, কখনো তামার মতো লাল্‌চে, কখনো বেগুণে, এই রকম নানা রঙের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। যে-সব মেঘের উচ্চতা কম, তাহা হইতে যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, অনেক সময়ে সেগুলিকে সাদা দেখায়। আবার আকাশের খুব উঁচু জায়গার বিদ্যুতের রঙ্ প্রায়ই বেগুণে হয়। তাহা হইলে দেখ, কত উঁচুতে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা রঙ্ দেখিয়া মোটামুটি আন্দাজ করা যাইতে পারে।

বজ্রপাত ও মেঘগর্জ্জন

বজ্রাঘাত অর্থাৎ বাজ-পড়া তোমরা দেখিয়াছ কি না জানি না। মেঘের বিদ্যুৎ যখন ছুটিয়া মাটিতে পড়ে, তখন সেই বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গকেই আমরা বাজ বলি। আমরা অনেক বাজ-পড়া দেখিয়াছি। বাড়ী-ঘর বা গাছের উপরে পড়িলে রক্ষা থাকে না; পুড়াইয়া ভাঙিয়া সব ছারখার করিয়া দেয়; কাছে মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী থাকিলে মারা যায়। আমাদের দেশের অনেক লোক প্রতিবৎসরেই বজ্রাঘাতে মারা যায়।

যাহা হউক, বজ্রাঘাত কি-রকমে হয় তোমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে। মনে কর, কাল-বৈশাখীর ঝড়ের সময়ে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ যেন ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া মাথার উপরে দাঁড়াইল। ধন-বিদ্যুৎ, কাছের জিনিষের নিকটতম অংশে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করে। কাজেই, এখানে মেঘের ধন-বিদ্যুতের টানে তাহার ঠিক্ নীচেকার মাটিতে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ হইবে। অর্থাৎ লীডেন্ জারের ভিতরকার এবং বাহিরের পর্দ্দায়

যেমন ক্রমে বিদ্যুৎ জমিতে আরম্ভ করে, এখানেও তাহাই হইতে থাকিবে। লীডেন্ জারের কাচ দুই বিদ্যুৎকে তফাতে রাখে। এখানে মেঘ ও মাটির মাঝের বাতাস ঐ দুই বিদ্যুৎকে তফাতে রাখিবে। কিন্তু জোর বেশি হইলে কোনো রোধক জিনিষই সেই বিদ্যুতের মিলন-পথে বাধা দিতে পারে না। মেঘে ও মাটিতে বেশি বিদ্যুৎ জমিলে ইহাই ঘটে,—তখন উহাদের মাঝের বাতাস বিদ্যুতের মিলনে বাধা দেয় না। কাজেই, মেঘের ধন-বিদ্যুৎ প্রকাণ্ড স্ফুলিঙ্গের আকারে নীচে নামিয়া মাটির বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিয়া যায়। ইহাকেই আমরা বজ্রপাত বলি।

বিদ্যুৎ-স্ফুরণের পরে অনেক সময়েই মেঘের ডাক শুনা যায়। এই মেঘগর্জ্জন কি-রকমে উৎপন্ন হয়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। বিদ্যুৎ যে-পথ দিয়া চলে, সেখানকার বাতাস হঠাৎ গরম হইয়া পড়ে। গরম পাইলে সব জিনিষই ফাঁপিয়া হাল্‌কা হয়। স্ফুলিঙ্গের পথের বাতাসও ফাঁপিয়া হাল্‌কা হয় এবং চারিদিকের গাঢ় বাতাসের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। কাজেই তখন পাশের বাতাস শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য ছুটাছুটি

লাগাইয়া দেয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বাতাসের এই আলোড়নেই মেঘগর্জ্জন হয়। যখন বিদ্যুৎ সোজা পথে চলিয়া কাছের মেঘে গিয়া পড়ে, তখন আমরা কামানের আওয়াজের মতো কেবল একটা শব্দ শুনিতে পাই। বিদ্যুৎ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিলেই, অনেকক্ষণ ধরিয়া গড়গড়ানি কানে আসে। ফাঁকা ঘরে চীৎকার করিলে, সেই শব্দে ঘরটা অনেকক্ষণ ধরিয়া গম্‌গম্‌ করে। কেন ইহা হয়, বোধ করি তোমরা জানো। চীৎকার করিলে বাতাসে যে-শব্দের ঢেউ উঠে, তাহা ঘুরিয়া-ফিরিয়া বার বার দেওয়ালের গায়ে প্রতিফলিত হয়। তাই শব্দ হঠাৎ লোপ পায় না। বাতাসকে আলোড়িত করিয়া মেঘের বিদ্যুৎ যে-শব্দের ঢেউ তোলে, তাহাও অনেকক্ষণ ধরিয়া মেঘে-মেঘে ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাতেও মেঘের ডাকের গড়গড়ানি অনেকক্ষণ ধরিয়া চলে।

তোমরা হয় ত লক্ষ্য করিয়াছ, বিদ্যুৎ চম্‌কাইবার কিছু পরে তাহার শব্দ আমাদের কানে আসে। মনে পড়িতেছে, ছেলে-বেলায় মেঘের ডাক শুনিলে বড় ভয় করিত। তাই বিদ্যুৎ চম্‌কাইলেই কানে আঙুল দিয়া বসিয়া থাকিতাম। তার পরে শব্দ বন্ধ

হইলে কান খুলিয়া দিতাম। এবারে বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে, বিদ্যুতের আলো চোখে আসিয়া পড়ার ছয়-সাত সেকেণ্ড পরে তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে। আবার দুই-এক সেকেণ্ড পরে শব্দ কানে আসিতেছে, ইহাও দেখা যায়। বিদ্যুৎ চম্‌কানোর সঙ্গে সঙ্গে আলো ও শব্দ হয়, তবে শব্দ পরে শুনা যায় কেন? মনে কর, তোমাদের স্কুলে দৌড়ের পাল্লা হইতেছে। দুইটি ছেলে এক জায়গা হইতে ঠিক্ একই সময়ে দৌড়িতে লাগিল। কে পাল্লায় জিতিবে বলা যায় না কি? যে তাড়াতাড়ি দৌড়ায় সেই ছেলেটিই জিতিয়া প্রাইজ পাইবে। মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে তাহার আলো ও শব্দের মধ্যে ঠিক্ এই রকমেরই একটা দৌড়ের পাল্লা আরম্ভ হয়। আলো ছুটিয়া চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে; আর শব্দ চলে অতি ধীরে ধীরে সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট্ বেগে। মনে কর, এক মাইল উপরকার মেঘ হইতে আলো ও শব্দ এই রকমে ছুটিয়া আমাদের কাছে আসিতেছে। কে আগে আসিবে বলা যায় না কি? হিসাব করিয়া দেখ, শব্দ কানে পৌঁছিতে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সময় লইবে এবং আলো যে

সময়টুকুতে চোখে আসিয়া পড়িবে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। সুতরাং আলো ও শব্দের এক মাইল রেসে আলোই জিতিবে। এই জন্যই বিদ্যুৎ চমকাইলে আলো দেখার অনেক পরে শব্দ শুনা যায়। সুতরাং যখন আলো দেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনা যায়, তখন বুঝিতে হয় বিদ্যুতের স্ফুরণ খুব কাছে হইয়াছে। নিকটে বাজ পড়িলে, তার আলো ও শব্দ প্রায় এক সঙ্গে আমাদের কাছে আসে। কাজেই, আলো দেখার কত সেকেণ্ড পরে শব্দ শুনা গেল ঘড়ি দেখিয়া ঠিক্ করিলে কত দূরে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইয়াছে জানা যায়।

মনে কর, কোনো সময়ে আলো দেখার ছয় সেকেণ্ড পরে যেন শব্দ শুনা গেল। শব্দ চলে সেকেণ্ডে ১১০০ ফিট। কাজেই বলা যাইতে পারে ৬ × ১১০০ অর্থাৎ ৬৬০০ ফিট্ তফাতের মেঘে বিদ্যুতের স্ফুরণ হইয়াছিল।

বিদ্যুতের আলো দেখা গেল, অথচ তাহার শব্দ কানে পৌঁছিল না, এই রকম ঘটনাও প্রায়ই ঘটে। কেন এমন হয় বলা কঠিন নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, দশটা কামান ছুড়িলে যে প্রকাণ্ড শব্দ হয়,

তাহা কুড়ি মাইলের বেশি দূরে পৌঁছায় না। কিন্তু মাঝে কোনো বাধা না থাকিলে তাহার উজ্জ্বল আলোককে দেড় শত মাইল তফাৎ হইতেও দেখা যায়। সুতরাং যখন বিদ্যুৎ চম্‌কানোর কেবল আলোই দেখা যায়, তখন বুঝিতে হয় অনেক দূরের মেঘে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইয়াছে, তাই শব্দ পৌঁছিতে পারিতেছে না।

বজ্র-বারক

মেঘের বিদ্যুৎ যখন বাজের আকারে মাটিতে নামে, তখন তাহা প্রায়ই মন্দিরের চূড়া, বাড়ির উঁচু জায়গা বা গাছের মাথায় আসিয়া পড়ে। আমরা একবার একটা তাল গাছের মাথায় এই রকমে বাজ পড়িতে দেখিয়াছিলাম। উঁচু মন্দিরের চূড়াকে ত প্রায়ই বজ্রাঘাতে ভাঙিতে দেখা যায়। বাজ কেন উঁচু জায়গায় পড়ে, তাহা বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। মেঘ হইতে নামিয়া বিদ্যুৎ যখন মাটিতে মিশিতে চায়, তখন যে রাস্তাটা অল্প, তাহা ধরিয়াই চলে। মেঘ হইতে মাটির দূরত্বের চেয়ে গাছের আগা বা মন্দিরের চূড়ার দূরত্ব অনেক কম। কাজেই, এই-সব উঁচু জায়গাতেই বাজ পড়ে। তা'ছাড়া আর একটা কারণ আছে। বাজ পড়ার আগে মেঘের বিদ্যুতের টানে মাটিতে বিপরীত বিদ্যুতের আবেশ হয়। কিন্তু এই বিদ্যুৎ কোন্ জায়গায় বেশি জমা হয় বলা যায় না কি? মাটির উপরকার মন্দিরের চূড়া ও গাছের আগা প্রভৃতি যে-সব জায়গায় ছুঁচ্‌লো বা সরু, সেখানেই

বিদ্যুতের গাঢ়তা বেশি হয়। কাজেই আকাশ হইতে নামিবার পথে মেঘের বিদ্যুৎ ঐ-সব জায়গায় পড়ে। যখন বার-বার বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া মেঘ ডাকে, তখন গাছের তলায় দাঁড়াইতে নাই বলিয়া একটা কথা আছে। ইহা মিথ্যা নয়। সে সময়ে উঁচু জায়গার কাছে দাঁড়াইলে সত্যই বিপদের আশঙ্কা থাকে।

কলিকাতা, ঢাকা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে ছয়-সাত তলা উঁচু বাড়ি এবং তার চেয়ে উঁচু কলের চিম্‌নি আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এগুলির উপরে বাজ পড়ে না কেন? তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, এই রকম উঁচু ইমারতে ধাতুর শিক লাগানো থাকে। এই শিককে বজ্র-বারক (Lighting Conductor) বলা হয়। তোমরা বজ্র-বারক দেখ নাই কি? এই ধাতুময় দণ্ডের গোড়াটা মাটির খুব নীচে পোঁতা থাকে এবং আগা থাকে ছাদকে ছাড়াইয়া অনেক উঁচুতে।

বজ্র-বারক দণ্ডে কি-রকমে বাজ পড়া নিবারণ করে, বোধ করি তোমরা জানো না। মনে কর, একখানা ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ বড় মেঘ যেন তোমাদের বাড়ির ঠিক্ উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। কাজেই, ইহা

বাড়ির সব জায়গায় ও মাটিতে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করিবে। এই বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই মুস্কিল। তখন নীচেকার ঋণ-বিদ্যুতের সহিত মিলিবার জন্য মেঘের ধন-বিদ্যুৎ বাড়ির উপরে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যদি বজ্র-বারক দণ্ড লাগানো থাকে, তাহা হইলে বিদ্যুৎ জমিতে পারিবে না। তোমারা আগেই দেখিয়াছ, যাহার আকৃতি ছুঁচের মতো বা যাহার মুখ সরু, তাহাতে বিদ্যুৎ জমিলেই বাহির হইয়া পড়ে। এখানে তাহাই ঘটে। উপরকার ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ মেঘ, ঘর-বাড়ি ও মাটিতে যে ঋণ-বিদ্যুতের আবেশ করে, তাহা ধীরে ধীরে বজ্র-বারকের সরু মুখ দিয়া বাহিরে যায় এবং তার পরে মেঘের গায়ে ঠেকিয়া সেখানকার ধন-বিদ্যুৎকে নষ্ট করে। এই রকমেই বাড়ি-ঘর বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পায়।

বজ্র-বারক বাড়িতে লাগাইবার কতকগুলি নিয়ম আছে। এই নিয়ম-অনুসারে লাগাইলে, প্রায়ই বাজের ভয় থাকে না। বজ্র-বারক যে, কেবল ধাতুর শিক্ দিয়াই তৈয়ারি হয়, তাহা নয়। লোহা বা তামার মোটা পাত দিয়াও কাজ চলিয়া যায়। মনে

রাখিয়ো, গোড়াটা যাহাতে সব সময়েই খুব তলাকার ভিজা মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে, এই রকমভাবে বজ্র-বারক পোঁতা দরকার। তা-ছাড়া বাড়ির কোনো জায়গায় যদি টিনের ছাদ থাকে, তবে তাহার সহিত বজ্র-বারকের

না
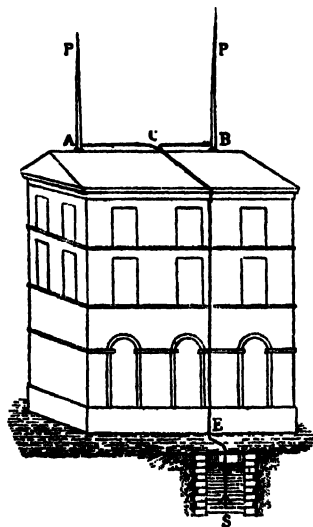
বজ্র-বারক

লে

যোগ রাখা প্রয়োজন। এই সব নিয়ম না মা[illegible] এলোমেলো ভাবে বজ্র-বারক লাগাইলেই হিতে বি[illegible] হয়। এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখ, কঠিন

বজ্র-বারকের গোড়া ইঁদারার জলের ভিতরে রহিয়াছে এবং তাহার আগাটা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সকলের উপরে লাগানো হইয়াছে। বজ্র-বারকের আগা যত বেশি বিভক্ত করিয়া বাড়ির ছাদে লাগানো যায়, ততই ভালো।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

লোকে মনে করে, বজ্রাঘাতে মারা যাইবার সময়ে প্রাণীরা বুঝি খুব কষ্ট পায়। কিন্তু তাহা নয়, ইহার চেয়ে সুখের মৃত্যু বোধ করি আর কিছুই নাই। মেঘ হইতে মাটিতে নামিতে বিদ্যুৎ এক সেকেণ্ডের লক্ষ লক্ষ ভাগের চেয়েও কম সময় লয়। বজ্রাঘাতে ইহার চেয়েও অল্প সময়েই মৃত্যু ঘটে। সুতরাং প্রাণী মৃত্যু-যন্ত্রণা পায় না। তাই, আমেরিকার খুনী আসামীদের ফাঁশি না দিয়া আজকাল বিদ্যুৎ দিয়া মারা হয়। মাথায় বাজ পড়িলে প্রাণীরা তৎক্ষণাৎ মারা যায়, কিন্তু যেখানে বাজ পড়ে সেখান হইতে পঞ্চাশ, এক শত এবংকখনো কখনো দুই শত হাত তফাতের গরু-বাছুরকে মরিতে দেখা যায়। কি-রকমে এই মৃত্যু হয় বোধ করি তোমরা তাহা জানো না। শরীরের ভিতরে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন হইলে তাহা কখনো কখনো মারাত্মক হয়। খুব রৌদ্রে বেড়াইয়া তোমরা যখন হঠাৎ বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান কর, তখন সর্দ্দি-গর্ম্মি প্রভৃতি অনেক কঠিন

রোগ দেখা দেয়। গরম শরীরকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করায় ইহা ঘটে। মাথার উপরকার মেঘ যখন নীচেকার মাটিতে বিদ্যুতের আবেশ করে, তখন তোমার-আমার সকলের শরীরে বিদ্যুৎ জমা হয়। তার পরে এক শত বা দুই শত হাত তফাতে যেই বাজ পড়ে অমনি ধনে-ঋণে মিলিয়া সব বিদ্যুৎ লোপ পায়। প্রাণি-শরীরে যে-বিদ্যুৎ জমিয়াছিল, তাহা এই রকমে লোপ পাইলে, শরীরের ভিতরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা সামান্য ব্যাপার নয়। ইহাতে প্রাণিমাত্রেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি পায়। বাজ পড়িলে দূরের গরু-বাছুর ও মানুষ এই রকমেই মারা পড়ে।

তোমরা এই-সব কথা শুনিয়া বোধ করি মনে করিতেছ বাজ অতি ভয়ানক জিনিষ। ভয়ানক বটে, কিন্তু ইহার জন্য সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকার কিছুই নাই। আমাদের এই বাংলা দেশে আট কোটি লোকের বাস। বৎসরে সাপের কামড়ে প্রায় তিন হাজার লোক মরে এবং বাঘের কামড়ে মরে প্রায় হাজার লোক। রেলে ও মোটরে কাটা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু বজ্রাঘাতে দশ-বারো বা কুড়ি জনের বেশি কখনই মরে না। কলিকাতা সহরে নয় লক্ষ লোকের বাস।

এ বৎসরে কিন্তু সেখানে একটা লোকেরও মাথায় বাজ পড়ে নাই। সুতরাং বাজের ভয় করা বৃথা। তোমরা যদি বাজের ভয় কর, তবে আগে রেলে চড়া ও মোটরে চড়া বন্ধ করা উচিত। বাজের চেয়ে রেলে ও মোটরে অনেক বেশি লোক মারা যায়।

আকাশে বিদ্যুতের উৎপত্তি

একটু বিদ্যুৎ তৈয়ারি করিতে গেলে যে কত হাঙ্গামা করিতে হয়, তাহা তোমরা জানো। কিন্তু মেঘে মেঘে যে-বিদ্যুৎ খেলিয়া বেড়ায়; কাল-বৈশাখীর ঝড়ের সময়ে যে-বিদ্যুৎ হাজারটা কামানের শব্দ করিয়া মাটিতে পড়ে, তাহার তৈয়ারিতে হাঙ্গামা নাই। তাহা অতি সহজে আপনা হইতেই মেঘে জমে এবং আপনা হইতেই লোপ পায়। ইহা দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। কি-রকমে আকাশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, জানিবার জন্য বোধ করি আজ দেড় শত বৎসর ধরিয়া নানা দেশের পণ্ডিতেরা নানা পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ঠিক্ ব্যাপারটি কেহই ধরিতে পারেন নাই। বেশি দিন নয়, দশ বৎসর আগে বিদ্যুতের উৎপত্তির কথায় বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন, নদী-সমুদ্রের জল যখন বাষ্প হইয়া আকাশের উপরে উঠে বা জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন আকাশে বিদ্যুৎ জমে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘরে বসিয়া জলকে বাষ্প করিলে বা জমাইলে বিদ্যুৎ পাওয়া যাইত

না। কাজেই, বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের ঐ-সব কথায় কেহ বিশ্বাস করিত না।

তোমরা বোধ করি ডাক্তার সিম্প্‌সনের (G. C. Simpson) নাম শুন নাই। পনেরো বৎসর আগে তিনি আমাদের এই ভারতবর্ষেরই আবহাওয়া বিভাগে কাজ করিতেন। নানা পরীক্ষায় তিনি আকাশের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তোমা-দিগকে কেবল তাহারি কথা বলিব। পৃথিবীর সব দেশেরই লোক আজকাল সিম্প্‌সনের আবিষ্কারকেই সত্য বলিয়া মানিতেছেন।

সিম্প্‌সনের আবিষ্কার বুঝিতে হইলে মেঘ ও বৃষ্টি-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। কাল-বৈশাখীর যে-সব ঝোড়ো মেঘ হইতে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হয় এবং বাজ পড়ে, তোমরা তাহাদের আকৃতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? এবারে যে দিন বিদ্যুৎ চম্‌কাইবে এবং মেঘ ডাকিবে, লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে, এই-সব মেঘের একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি আছে। অনেক মেঘই পৃথিবীর পাঁচ মাইল উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু এই মেঘকে এক মাইলের উপরে আর দেখা যায় না। পরপৃষ্ঠায় বিদ্যুৎপূর্ণ ঝোড়ো মেঘের

একটা ছবি দিলাম। দেখ, ইহার তলাটা কালো এবং মাথাটা বরফে-ঢাকা পাহাড়ের ছোটো-বড় চূড়ার মতো সাদা। দেখিলেই মনে হয়, কে যেন তূলার বস্তা উপরে উপরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই মেঘকে ইংরাজিতে Cumulus বলা হয়। আমরা ইহার নাম দিলাম স্তূপ মেঘ। শরৎকালে এই রকম মেঘকে

স্তূপ মেঘ

তোমরা আকাশের কোলে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কিন্তু বৈশাখের বিকালে এগুলি যখন পশ্চিমের আকাশে জমে, তখন গায়ে-গায়ে লাগা থাকে বলিয়া ঐ আকৃতি চেনা যায় না। তখন তাহাদের তলাগুলাকে আমরা

নিবিড় কালো দেখি, আর মাথাগুলাকে দেখি সাদা। পশ্চিমে ঝড়ে ভাসিতে ভাসিতে যখন এই মেঘ আমাদের মাথার উপরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনো ইহাদের ঠিক্ চেহারা নজরে পড়ে না। এই সময়ে কেবল তলাটাই চোখে পড়ে। তাই মাথার উপরকার স্তূপ-মেঘকে আমরা কালো দেখি। মনে রাখিয়ো, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি অনেক উৎপাত প্রায়ই এই মেঘ হইতে হয়। বর্ষায় এ-রকম মেঘ প্রায়ই আকাশে জমে না, তাই সে-সময়ে ঐ-সব উৎপাত খুবই কম থাকে।

নদী-সমুদ্র ইত্যাদির জল বাষ্প হইয়া যখন আকাশের উপরকার খুব ঠাণ্ডা জায়গায় যায়, তখন তাহা জমিয়া জলের কণা হইয়া দাঁড়ায়। এই রাশীকৃত জলকণাকে আমরা মেঘের আকারে দেখি। কিন্তু বিদ্যুৎপূর্ণ স্তূপ-মেঘের ঐ-রকম আকৃতি কেন হয়, বোধ করি তোমরা জানো না। চৈত্র-বৈশাখে রৌদ্রের তেজ কি-রকম থাকে মনে করিয়া দেখ। এই তেজে নদী-সমুদ্রের জল এবং মাটির উপরকার বাতাস গরম হইয়া পড়ে। গরম পাইলেই জল বাষ্পীভূত হয় এবং বাতাস হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে।

কাজেই, জলীয় বাষ্প আর মাটির উপরে থাকিতে পারে না,—তাহা বাতাসের সঙ্গে মিলিয়া আকাশের উপরে উঠে। তার পরে উঁচু ঠাণ্ডা জায়গায় পৌঁছিলে সেই জলীয় বাষ্পই জমিয়া মেঘ হইয়া দাঁড়ায়। স্তূপ-মেঘের চূড়াগুলিকে লক্ষ্য করিয়ো, নীচেকার বাষ্পই যে উপরে উঠিয়া জমাট বাঁধিতেছে, উহার আকৃতি দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিবে। তাহা হইলে দেখ, স্তূপ-মেঘের উৎপত্তির জন্য জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন এবং তা'ছাড়া নীচে হইতে উপর দিকে একটা বাতাসের প্রবাহ থাকাও দরকার। বাতাসের প্রবাহে জলীয় বাষ্প খুব উঁচুতে উঠে বলিয়াই স্তূপ-মেঘে অল্পক্ষণের জন্য বেশি বারিপাত ও শিলাবৃষ্টি হয়। ইহার ভিতরে বাতাসের যে গতি আছে, তাহা শিলাবৃষ্টি দেখিলেই জানা যায়। বৃষ্টির বিন্দু বাতাসের ঠেলায় আকাশের খুব উঁচু জায়গায় না পৌঁছিলে তাহা জমিয়া শিলার আকৃতি পায় না।

আর একটি কথা তোমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন। পঞ্চাশ-ষাট মাইল উপর হইতে যখন উল্কাপিণ্ড জোরে মাটিতে পড়ে, তখন তাহার কতক অংশ পুড়িয়া ছাই হয় বটে, কিন্তু বাতাসের চাপে

ভাঙিয়া চুরমার হয় না। আমরা বন্দুক হইতে যে গুলি ছুড়ি তাহা সেকেণ্ডে আধ মাইল অর্থাৎ ৮৮০ গজ বেগে ছুটিয়া চলে। ইহাতে বাতাস চাপ দেয়, কিন্তু সেই চাপে গুলি ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যায় কি? কখনই যায় না। কিন্তু জল যখন খুব উঁচু হইতে পড়ে, তখন তাহা নিজের আকৃতি ঠিক রাখিতে পারে না। এই অবস্থায় জলের ফোঁটা ভাঙিয়া ছোটো ছোটো বিন্দু হইয়া পড়ে। আবার এই বিন্দুগুলির ব্যাস কখনই $\frac{১}{৫}$ ইঞ্চির বেশি হইতে দেখা যায় না। জলবিন্দুর ব্যাস কেন $\frac{১}{৫}$ ইঞ্চির বেশি হয় না, তাহার কথা এখানে বলা চলিবে না। গণিতের সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ইহা দেখানো যায়। আর একটা কথা তোমাদের মনে রাখা দরকার যে, জলের ফোঁটা যত বড়ই হউক না কেন, তাহা বাতাসের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে নয় গজ বেগে নীচে নামিতে গেলেই ভাঙিয়া ছোটো বিন্দুতে পরিণত হয়। কেবল ইহাই নয়, যখন নীচেকার বাতাস সেকেণ্ডে নয় গজ বেগে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে, তখনও সেই প্রবাহের বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা নিজের আকৃতি ঠিক রাখিতে পারে না। এই অবস্থাতেও বড় ফোঁটাগুলি ভাঙিয়া ছোটো ছোটো

জলকণা হইয়া দাড়ায়। অর্থাৎ নিজের বেগ বা বাতাসের বেগ যদি সেকেণ্ডে নয় গজের বেশি হয়, তবে বড় জলবিন্দুর মহা বিপদ ঘটে। তখন তাহা ভাঙিয়া-চুরিয়া ছোটো হইয়া দাঁড়ায়। বৃষ্টির সময়ে তালের মতো বা বেলের মতো বড় জলের ফোঁটা কেন মাটিতে পড়ে না, ইহা হইতে তাহা জানা যায়। হাঁসের ডিমের মতো বড় শিলা বৃষ্টির সঙ্গে পড়িতে দেখিয়াছি। ইহার কথা স্বতন্ত্র। জলবিন্দু হইতে জন্মিলেও সেগুলি জলবিন্দু নয়। তাই এই নিয়ম শিলাতে খাটে না। জলের বড় বিন্দুর বেগ নয় গজের বেশি হইলে কেন ভাঙিয়া যায়, ইহাও অঙ্ক কষিয়া দেখানো চলে। কয়েক বৎসর আগে জর্ম্মান পণ্ডিত লেনার্ড (Lenard) ইহা গণিতেরই সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মেঘ এবং তাহার ভিতরকার বায়ু-প্রবাহ ও জল-বিন্দুসম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেল। কিন্তু মেঘে কোথা হইতে বিদ্যুৎ জমে, তাহা এখনো বলা হয় নাই। আমরা আগে যে সিম্‌সন্ সাহেবের নাম করিয়াছি, বেশি দিন নয়, কুড়ি বৎসর আগে তিনিই বিদ্যুৎ-উৎপত্তির রহস্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন। সিমলার পাহাড়ে বসিয়া পরীক্ষা করার সময়ে তিনি

দেখিয়াছিলেন, নিজের বেগ বা বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে নয় গজের বেশি হইলে যখন বড় জলবিন্দুগুলি ভাঙিয়া ছোটো হয়, তখন ছোটো বিন্দুগুলিতে ধন-বিদ্যুৎ এবং তাহার চারিদিকের বাতাসে ঋণ-বিদ্যুৎ আপনা হইতেই জন্মে। কেন জন্মে তাহার কারণ দেখানো কঠিন নয়। জলের পরমাণু হইতে কতকগুলি ইলেক্ট্রন্ ছিট্‌কাইয়া বাহির হয় বলিয়াই ইহা ঘটে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা গেল, তাহা যদি তোমরা বুঝিয়া থাকো, তবে মেঘে কি-রকমে বিদ্যুৎ জন্মে তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে। মনে করা যাউক, গরম বাতাসের প্রবাহে এক গাদা জলীয় বাষ্প আকাশের খুব উঁচু জায়গায় গিয়া জমাট বাঁধিল এবং জল-বিন্দুর আকারে নীচে নামিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের জানা আছে, বড় জলবিন্দুর বেগ বা বাতাসের বেগ যখন সেকেণ্ডে নয় গজের বেশি হয়, তখন তাহা ভাঙিয়া ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ ছোটো জল-কণা হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, নীচে নামিবার সময়ে জলবিন্দুর মধ্যে যেগুলি ঊর্দ্ধগামী বাতাসের প্রবল-প্রবাহের মধ্যে পড়ে, সেগুলি আর জলবিন্দুর আকারে থাকিতে পারে না,—তখন সেগুলি হইয়া দাঁড়ায়

ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ হাল্‌কা জলের কণা। হাল্‌কা জিনিষের বিপদ্ অনেক। প্রবল বাতাসে ঠেকিলে সেগুলিকে বাতাসের সঙ্গেই চলিতে হয়। এখানেও তাহা ঘটে। যে-সব বড় বড় জলের ফোঁটা নীচে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ভাঙিয়া ছোটো ও হাল্কা হইয়া পড়ায় সেগুলিকে বাতাসের সঙ্গে আবার উপরে উঠিতে হয়। কিন্তু উপরে উঠিয়াও তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। তোমরা জানো, একই বিদ্যুতে পূর্ণ দুইটা জিনিষ কাছাকাছি থাকিলে পরস্পর দূরে যাইবার জন্য চেষ্টা করে। কাজেই, একই ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ জলকণাগুলি উপরে উঠিয়া পৃথক্ থাকিবার জন্য পরস্পরকে ভয়ানক এলোমেলো ভাবে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে জলকণাগুলির দুইটা, চারিটা বা দশ-বিশটাতে মিলিয়া আবার বড় বড় ফোঁটার আকার পায়। কিন্তু এই ফোঁটার সঙ্গে আগেকার বড় ফোঁটাগুলির অনেক তফাৎ দেখা যায়। আগেকার ফোঁটায় বিদ্যুৎ ছিল না। এই নূতন ফোঁটাগুলির প্রত্যেকটিতে প্রচুর ধন-বিদ্যুৎ জমা থাকে।

তার পরে কি হয়, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। বিদ্যুৎ-পূর্ণ বড় ফোঁটাগুলি আবার নীচে নামে,

আবার ছোটো কণায় বিভক্ত হয় এবং আবার উপরে আসিয়া বড় ফোঁটা হইয়া দাঁড়ায়। জলবিন্দুর এই রকম উঠানামা দু'বার বা চারিবার নয়, কিছুক্ষণ ধরিয়া অবিরাম চলে এবং প্রত্যেক উঠানামার সঙ্গে জলবিন্দুতে ধন-বিদ্যুতের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়াই যায়। কিন্তু ঋণ-বিদ্যুৎ যায় কোথায়? জলের ফোঁটাগুলি অধিকাংশ ধন-বিদ্যুৎ সঙ্গে করিয়া বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়িলে মেঘের চূড়াগুলি ঋণ-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া যায়। তার পরে এই বিদ্যুৎ যেমনি পরিমাণে বেশি হয়, অমনি মেঘের অন্য অংশে ধন-বিদ্যুতের আবেশ করে। ইহার পরে দুই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গাকারে পরস্পর মিলিয়া যায়। আমরা নীচে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিয়া বলি, মেঘে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে। কিন্তু সব ঋণ-বিদ্যুৎ এই রকমে লয় পায় না। ইহার কতক কখনো কখনো ছোটো জলবিন্দুর সহিত বৃষ্টির সময়ে মাটিতে নামিয়া পড়ে।

তোমরা বোধ করি মনে কর, কেবল আমাদের দেশেই বুঝি শিলাবৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হয়। কিন্তু তাহা নয়, বিদ্যুতের উৎপাত ও বজ্রাঘাত হইতে কোনো দেশেরই মুক্তি নাই। একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীতে প্রতি বৎসরেই প্রায় দেড়

কোটী বার বিদ্যুতের সঙ্গে ঝড় হয় এবং প্রত্যেক সেকেণ্ডে পৃথিবীর আকাশে এক শতবার করিয়া বিদ্যুৎ চমকায়। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কোনো লোক চাঁদে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে দেখে, তাহা হইলে ইহাকে একটা বিদ্যুতের গোলক বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না, মেঘে যে-বিদ্যুৎ জমে তাহা পরিমাণে খুব বেশি। আমরা যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গকে এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে লাফাইতে দেখি, তাহাতে বিদ্যুতের পরিমাণ খুব কমই থাকে। একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, আমাদের ঘরের বিদ্যুতের বাতিতে এক মিনিটে যতটা বিদ্যুৎ চলে, মেঘের এক-একটা বড় স্ফুলিঙ্গে তার বেশি বিদ্যুৎ থাকে না। যে-বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বাজের আকারে মাটিতে নামিলে বড় বাড়ী ভাঙিয়া যায়, মানুষ-গরু মারা পড়ে, তাহার পরিমাণ এত অল্প যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কিন্তু ইহা সত্য। এই অল্প বিদ্যুতের চাপ অত্যন্ত বেশি থাকে বলিয়াই, তাহা এত অনিষ্ট করে।

কথাটা বোধ করি তোমরা বুঝিলে না। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। বন্দুকের একটা ছোটো

গুলিকে আস্তে আস্তে মাথায় বা গায়ে ফেলিলে কোনোই অনিষ্ট হয় না। কিন্তু সেই গুলিই যখন বন্দুকের মুখ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া চলে, তখন তাহার চাপ রোধ করা দায় হয়। এই অবস্থায় উহা ইট, কাঠ, এমন কি লোহার পাতকেও ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলে। মেঘের বিদ্যুতের ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকমের। ছোটো গুলির মতো তাহা পরিমাণে অল্প, কিন্তু চাপ এত প্রবল যে, পৃথিবীর কোনো জিনিষই তাহাকে সামলাইতে পারে না।

বিদ্যুতের শক্তি

মনে কর, একটা পাত্রে খানিকটা জল আছে। পাত্রে জল রাখিলেই তাহার তলায় চাপ পড়ে এবং জলের উচ্চতা অনুসারে এই চাপ কমে-বাড়ে। তার পরে মনে করা যাউক, যেন এই জলটুকুকেই একটা সরু নলের ভিতরে ঢালিলাম। যে-জল বড় পাত্রে ছড়াইয়াছিল, নলের ভিতরে গিয়া তাহাই খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইল। এখন নলের তলায় কি-রকম চাপ পড়িবে বলা যায় না কি? উচ্চতা বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং আগে প্রশস্ত পাত্রের তলায় যে চাপ পড়িতেছিল, সরু নলের তলায় তাহার অনেকগুণ বেশি চাপ পড়িবে। অথচ পাত্রে যে জলটুকু ছিল, নলে ঠিক্ সেইটুকু জলই রহিয়াছে। কাজেই, বলিতে হয়, পাত্রভেদে জলের চাপ-পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পরপৃষ্ঠার ছবিখানি দেখ। দুইটি পাত্রে জল আছে। এক পাত্রের জল উঁচু এবং আর এক পাত্রের জল নীচু। পাত্রের তলা সরু নল দ্বারা সংযুক্ত আছে।

বাম দিকের পাত্রের উঁচু জল এই অবস্থায় তলাকার নল দিয়া জোরে ডাইনের পাত্রে প্রবেশ করিয়া দুই পাত্রের জলের উচ্চতা একই করিয়া দিবে। দুই পাত্রের জলের উচ্চতা এক নয় বলিয়া ইহা ঘটিল।
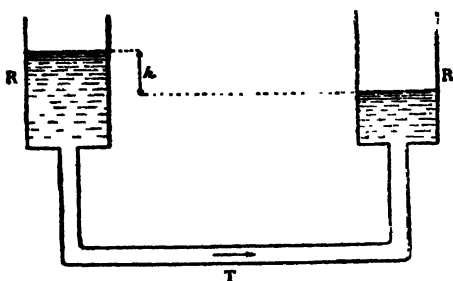
উঁচু-নীচু জল।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, একটা বড় লোহার গোলাকে উনুনের কাছে রাখা গেল। উনুনের তাপ পাইয়া গোলা গরম হইল। হাত দিয়া দেখা গেল, পাশের অন্যান্য জিনিষের চেয়ে লোহা বেশি গরম হইয়াছে। এখন মনে কর, এই বড় লোহার গোলাতে যতটা তাপ আছে, সেটুকুকে যেন একটা ভাঁটার মতো ছোটো গোলাতে প্রবেশ করানো গেল। এখন কি হইবে বলা যায় না কি? বড় গোলা যত গরম ছিল, ভাঁটা তার চেয়ে অনেক

বেশি গরম হইয়া পড়িবে। হয় ত তাহা গরমে লাল হইয়া উঠিবে,—তাহার গায়ে হাত দেওয়া যাইবে না। তাহা হইলে দেখ, গোলায় এবং ভাঁটায় সমান তাপ থাকিলেও, বড় জিনিষ ছাড়িয়া ছোটোতে আশ্রয় লওয়ায় তাপ-শক্তি বাড়িয়া গেল।

তোমরা জলের চাপে এবং তাপে যে শক্তির পরিবর্ত্তন দেখিলে, বিদ্যুতের শক্তিরও সেই রকম পরিবর্ত্তন আছে। জলের চাপের এবং তাপের শক্তি যেমন কেবল পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না, বিদ্যুতের শক্তিও কেবল পরিমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বাড়ে-কমে না।

মনে কর, একটা তে-কোণা ধাতুর গোলককে বিদ্যুৎ-যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যুৎ বেশি জমিবে কোথায় ? তোমরা আগেই দেখিয়াছ, পরিচালক জিনিষে যে-সব সরু বা ছুচ্‌লো অংশ থাকে, সেখানেই বিদ্যুতের গাঢ়তা বেশি থাকে। কাজেই, ঐ জিনিষটার কোণ-গুলিতেই বিদ্যুৎ জমিবে বেশি। এখন একটা বিদ্যুৎ-দর্শক যন্ত্রের মাথায় রেশম-মোড়া তার বাঁধিয়া তারের অপর প্রান্ত ধীরে ধীরে ঐ বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষটির গায়ে লাগাও। তার দিয়া যন্ত্রের সোনার পাতে বিদ্যুৎ

পৌঁছিবে এবং পাতা দুটি ফাঁক হইয়া পড়িবে। তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, জিনিষটির যে-জায়গায় বিদ্যুৎ গাঢ় আছে, সেখানে তার ছোঁয়াইলে বিদ্যুৎ-দর্শকের সোনার পাতা বেশি ফাঁক হইবে। কিন্তু তাহা হয় না,—বিদ্যুৎ-যুক্ত জিনিষের যে অংশেই তার ছোঁয়াও না কেন, পাতার ফাঁক একই থাকিবে। মনে রাখিয়ো, বিদ্যুতের শক্তিই পাতাকে ফাঁক করে। তাহা হইলে এই পরীক্ষায় দেখা গেল, জিনিষটার বিদ্যুতের শক্তি সব জায়গাতেই সমান, ইহা বিদ্যুতের গাঢ়তা চাপ বা পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না।

আবার মনে কর, দুইটা পাত্রে জল আছে। একটা পাত্রের জল উঁচু এবং অপর পাত্রের জল নীচু। এই দুই পাত্রের তলা একটা নল দিয়া যুক্ত কর। এখন কি হইবে বলা যায় না কি? উঁচু জল অপর পাত্রের নীচু জলের মধ্যে গিয়া দুই পাত্রের জলের উচ্চতাকে এক করিয়া দিবে। বিদ্যুতেও তাহাই দেখা যায়। বিদ্যুৎ-যুক্ত দুইটা জিনিষের মধ্যে যদি একটার শক্তি অপরের চেয়ে বেশি থাকে তবে পরস্পর সংযুক্ত হইলেই বেশি শক্তিযুক্ত জিনিষের বিদ্যুৎ কম শক্তিযুক্ত জিনিষে গিয়া দুইয়েয় শক্তি এক করিয়া দেয়। কিন্তু যাহাদের

শক্তি আগেই এক আছে, তাহাদিগকে সংযুক্ত করিলে কাহারো শক্তির কোনো পরিবর্ত্তন হয় না।

কেমন করিয়া বিদ্যুতের শক্তি মাপা যায়, এখন সেই কথাটি তোমাদিগকে বলিব। মনে কর কোনো জায়গায় যেন একটি ধন-বিদ্যুতে পূর্ণ জিনিষ রহিয়াছে। এখন যদি আর একটা ধন-বিদ্যুৎ-পূর্ণ জিনিষকে ধীরে ধীরে প্রথমের কাছে আনা যায় তাহা হইলে কি হয় অনায়াসেই বলা চলে। একই বিদ্যুতে পূর্ণ জিনিষের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা দেয়। কাজেই, দ্বিতীয়টিকে প্রথমের কাছে আনিতে গেলেই সে তফাতে যাইতে চেষ্টা করিবে; একটু জোর প্রয়োগ না করিলে কাছে আসিবে না। কেবল ইহাই নয়—দ্বিতীয় জিনিষটাকে যতই প্রথমের কাছে আনা যাইবে, আমাদের হাতের জোর ততই বেশি লাগিবে। মনে কর, দ্বিতীয় জিনিষটাতে অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ না থাকিয়া যেন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। অর্থাৎ মনে করা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা যে-পরিমাণকে বিদ্যুতের মাত্রা (Unit) বলেন, দ্বিতীয় জিনিষটিতে যেন ঠিক্ সেই পরিমাণে বিদ্যুৎ আছে এবং সেই বিদ্যুৎটুকুকে যেন আমরা অনন্ত দূর হইতে প্রথম জিনিষটির কাছে

আনিতেছি। আগে যাহা দেখা গিয়াছিল, এখানেও তাহা ঘটিবে। এই এক মাত্রা পরিমিত ধন-বিদ্যুৎটুকুকে টানিয়া আনিতে বলের প্রয়োজন হইবে এবং তাহাকে যতই প্রথম জিনিষটির কাছে আনা যাইবে, ততই বেশি বল প্রয়োগের দরকার হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এক মাত্রা পরিমিত ধন-বিদ্যুৎকে কোনো বৈদ্যুতিক শক্তির বিরুদ্ধে অনন্ত দূর হইতে কোনো নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আনিতে যে বল প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাই ঐ জায়গার বৈদ্যুত-শক্তি (Potential)। এই রকমে প্রত্যেক জায়গারই বৈদ্যুত-শক্তি ঠিক করা চলে।

তাহা হইলে দেখ, যখন কোনো বিদ্যুৎ-পূর্ণ জিনিষ এক জায়গায় স্থির থাকে, তখন তাহার চারিদিকের সর্ব্বত্র বৈদ্যুত-শক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহার কাছের বৈদ্যুত-শক্তিকে দূরের শক্তির চেয়ে বেশি হইতে দেখা যায়। উঁচু জায়গার জল যেমন গড়াইয়া নীচু জায়গায় ছুটিয়া চলে, গরম জিনিষের তাপ যেমন ঠাণ্ডা জিনিষে যায়, ঠিক্ সেই রকমেই যেখানকার বিদ্যুৎ-শক্তি বেশি সেখান হইতে কম শক্তির দিকে বিদ্যুৎ ছুটিয়া যায় এবং শেষে ইহাতে দুইয়ের শক্তি এক হইয়া দাঁড়ায়।

দার্জিলিঙের উচ্চতা ৬০০০ ফিট্, হিমালয়ের

গৌরীশঙ্করের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট্। এই রকমে অনেক জায়গার উচ্চতা আমরা নির্দ্দেশ করি। ইহার অর্থ কি, বোধ করি তোমরা জানো। কোনো জায়গার উচ্চতার কথা বলিতে গেলে, তাহা সমুদ্রতল হইতে কত উঁচু তাহাই আমরা প্রকাশ করি। কাজেই, যখন দার্জিলিঙের উচ্চতা ৬০০০ ফিট্ বলা হয়, তখন বুঝিতে হয়, সমুদ্রতল হইতে উহা ৬০০০ ফিট্ উঁচুতে আছে। অর্থাৎ সমুদ্রতলের উচ্চতা ০ এবং দার্জিলিঙের উচ্চতা ৬০০০ ফিট্। মাপ-জোঁকের ব্যাপারে এই রকমে একটা জায়গাকে ০ ধরিয়া মাপা আরম্ভ করিতে হয়। বৈদ্যুত-শক্তি মাপিবার সময়েও আমরা তাহাই করি। পৃথিবীর মতো প্রকাণ্ড জিনিষে একটুখানি বিদ্যুৎ আশ্রয় লইলে তাহা বিদ্যুৎযুক্ত হয় না। তাই সকল সময়েই ভূতলের বিদ্যুৎশক্তিকে ০ ধরিয়া হিসাব করা হয়। তা'ছাড়া বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষ হইতে অনন্ত দূরে একটুও বৈদ্যুত-শক্তি থাকে না বলিয়া, সেখানকারও বিদ্যুৎ-শক্তিকে ০ ধরা হয়। তাহা হইলে দেখ, কোনো বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষের শক্তির পরিমাণকে যখন পাঁচ বা দশ বলি, তখন বুঝিতে হয়, পৃথিবীর বিদ্যুৎ-শক্তি ০ হইলে, জিনিষটির শক্তি পাঁচ বা দশ হইয়া দাঁড়ায়।

বৈদ্যুত-শক্তিকে আবার ধন ও ঋণ চিহ্ন দিয়া প্রকাশ করা হয়। কোনো জিনিষের বৈদ্যুত-শক্তি যদি পৃথিবীর বৈদ্যুত-শক্তির চেয়ে বেশি থাকে, তখন সেই শক্তিকে ধন-শক্তি বলা হয়। এই অবস্থায় জিনিষটি মাটির সহিত যুক্ত হইলেই তাহার বিদ্যুৎ মাটিতে চলিয়া যায়। বৈদ্যুত-শক্তি ঋণ হইলে বুঝিতে হয়, জিনিষটির শক্তি পৃথিবীর ০ শক্তির চেয়ে কম।

বিদ্যুতের ক্রিয়া

এ-পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে তোমরা বিদ্যুতের অনেক পরিচয় পাইলে। কিন্তু স্ফুলিঙ্গাকারে এক জায়গা হইতে অন্যত্র যাইবার সময়ে বিদ্যুৎ কি-কি কাজ করে, তাহা এখনো বলা হয় নাই।

প্রথমেই দেখ, স্ফুলিঙ্গাকারে চলিবার সময়ে বিদ্যুতে তাপ ও আলো পাওয়া যায়। বজ্রের বিদ্যুতে খড়ের ঘরে এবং শুক্না গাছে আগুন ধরে এবং কাছে গরু-বাছুর বা মানুষ থাকিলে তাহাদের শরীর ঝল্সাইয়া যায়। ইহা বোধ করি তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়াছ। তা'ছাড়া কোনো বাড়ীতে বাজ পড়িলে বিদ্যুতের পথে যে-সব ধাতুময় জিনিষ থাকে, সেগুলিকে আমরা গলিয়া যাইতেও দেখি। বিদ্যুতের আলোর পরিচয় তোমরা অনেক পাইয়াছ। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যখন এক মেঘের বিদ্যুৎ অন্য মেঘে ছুটিয়া চলে, তখন বিদ্যুতের দিকে তাকাইলে যেন চোখ ঝল্সাইয়া যায় এবং চারিদিক্টাতে যেন দিনের আলো ফুটিয়া উঠে। ইহাই বিদ্যুতের আলো। কিন্তু

এই সকল দেখিয়া তোমরা যেন মনে করিয়ো না, তাপ, আলোক এবং বিদ্যুৎ একই জিনিষ। বিদ্যুৎ যখন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায়, তখন তাপ ও আলো উৎপন্ন করে মাত্র। বিদ্যুৎকে তাপ বা আলো বলিলে মহা ভুল করা হয়। যাহা হউক, তাপ ও আলোকের ক্রিয়া ছাড়া রাসায়নিক, যান্ত্রিক (Mechanical) এবং দৈহিক এই তিনটি ক্রিয়াও বিদ্যুতে দেখা যায়।

বিদ্যুতের রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিচয় তোমরা পরে অনেক দেখিতে পাইবে। যেখানে বিদ্যুতের স্ফুরণ হয়, সেখানকার বাতাসের অক্সিজেন রূপান্তরিত হইয়া ওজোন্ নামে একটা নূতন বাষ্পীয় জিনিষে পরিণত হয়। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য কর নাই, কিন্তু আমরা অনেক দেখিয়াছি, দুই-চারি শত গজ তফাতে বাজ পড়িলে গন্ধক পোড়ার মতো এক রকম গন্ধ নাকে আসে। ইহাই সেই ওজোনের গন্ধ। যখন বৈদ্যুত-যন্ত্র হইতে ঘন ঘন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, তখনো সেখানকার বাতাসে ওজোনের গন্ধ পাওয়া যায়।

বিদ্যুতের যান্ত্রিক ক্রিয়ার কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। যখন বজ্রের আকারে বিদ্যুৎ ঘর-বাড়ীতে পড়ে, তখন সেখানকার ইট-বালি সকলি খসিয়া যায়।

ইহা হইতে তাহার যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। লীডেন্ জারের দুই পর্দ্দা যোগ করিতে গেলে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, ইহা তোমরা জানো। এই স্ফুলিঙ্গের পথে কাগজ বা পাতলা কাচ বা অন্য অপরিচালক জিনিষ রাখিলে তাহা বিদ্যুতের যান্ত্রিক ক্রিয়াতেই ফুটা হইয়া বা ফাটিয়া যায়।

বৈদ্যুত-যন্ত্রের কাছে আঙুল রাখিলে যখন স্ফুলিঙ্গ আঙুলে ঠেকে, সে-সময়ে একটু সামান্য বেদনা বোধ হয়। ইহাই বিদ্যুতের দৈহিক ক্রিয়া। স্ফুলিঙ্গের জোর বেশি হইলে, এই বেদনা এত বাড়িয়া যায় যে, মানুষ, ঘোড়া গরু প্রভৃতি বড় প্রাণীরাও তাহা সহ্য করিতে পারে না। বজ্রাঘাতে বিদ্যুতের এই দৈহিক ক্রিয়াতেই প্রাণীরা মারা যায়।

বিদ্যুতের দৈহিক ক্রিয়া দেখাইবার জন্য একটি সুন্দর পরীক্ষা আছে। লীডেন্ জারের বাহির ও ভিতর পর্দ্দায় যে কত বিদ্যুৎ জমে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। বেশি বিদ্যুৎ জমে বলিয়াই জারের বাহিরের পর্দ্দাকে ছুঁইয়া মাঝের ডাণ্ডার কাছে আঙুল রাখা বিপজ্জনক। তখন বিদ্যুৎ এত জোরে আঙুলে লাগে যে, তাহার ঝাঁকুনি সহ্য করা দায় হয়। তাই লীডেন্

জার্‌কে বিদ্যুৎযুক্ত করিয়া নাড়াচাড়া করিতে গেলে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। এখন মনে কর, তোমাদেরই মধ্যে যেন দশ-বারো জন ছেলে একের বাঁ হাত অন্যের ডাইন হাতকে ছুঁইয়া গোলাকারে দাঁড়াইয়াছে। প্রথম ছেলেটির ডাইন হাতে বিদ্যুৎপূর্ণ লীডেন্ জার্ আছে। সে বাহিরের পর্দ্দায় হাত রাখিয়া জার্‌টিকে ধরিয়াছে। এখন যদি জারের ডাণ্ডাটিকে শেষের ছেলের ডাইন হাতের আঙুলের কাছে আনা যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? ছেলেরা পরস্পরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাজেই, বাহিরের পর্দ্দার সঙ্গে সকলেরি যোগ রহিয়াছে। ইহাতে প্রথম ছেলের হাতের জার্ হইতে শেষের ছেলের আঙুলে একটা মোটা স্ফুলিঙ্গ ঠেকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাতের কব্জিতে একটা ঝাঁকুনি পাইবে। এই ঝাঁকুনিকেও বিদ্যুতের দৈহিক ক্রিয়ার একটা উদাহরণ বলা যাইতে পারে।

এই সব ক্রিয়া ছাড়া চুম্বক-শক্তি উৎপন্ন করা প্রভৃতি বিদ্যুতের যে ক্রিয়া আছে, তাহার কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সেই জন্য তাহার কথা এখানে আর বলা হইল না।

বিদ্যুতের উৎপত্তি

দুই পৃথক্ জিনিষকে ঘষিলে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এবং বিনা ঘর্ষণে মেঘে বিদ্যুৎ জন্মে, তোমরা এই সব কথা জানো। তা'ছাড়া কোনো বিদ্যুৎযুক্ত জিনিষের কাছে পরিচালক জিনিষ রাখিলে তাহাতে যে বিদ্যুতের আবেশ হয়, তাহার কথাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। এগুলি ছাড়া আরো কয়েক রকমে বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এখানে তাহারি একটু পরিচয় দিব।

কতকগুলি জিনিষকে হঠাৎ টানিয়া ছিঁড়িলে ফাটাইলে বা তাহাতে চাপ দিলে বিদ্যুৎ জন্মে। তোমরা বোধ করি ইহা দেখ নাই। অন্ধকার ঘরে মিছরির কুঁদো বা তাহার বড় বড় দানাকে ফাটাইতে বা গুঁড়া করিতে গেলে, প্রায়ই তাহার গায়ে এক রকম মৃদু আলো দেখা যায়। তোমরা বাড়ীতে ইহার পরীক্ষা করিয়ো। মিছরিকে ফাটাইতে গেলে যে-বিদ্যুৎ জন্মে

ইহা তাহারি আলো। অন্ধকার ঘরে শুক্‌না কাগজ বা ন্যাক্‌ড়া টানিয়া ছিঁড়িতে গেলে কখনো কখনো বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। কাজেই বলিতে হয়, টানিয়া ছেঁড়ার জন্যও অপরিচালক জিনিষে বিদ্যুৎ জন্মে।

একখানি জলন্ত কয়লার সঙ্গে বৈদ্যুত-দর্শক যন্ত্রের ডাণ্ডা সংযুক্ত কর। দেখিবে, এই অবস্থায় সোনার পাত দুখানি ফাঁক হইয়া পড়িতেছে। কোনো জিনিষ পুড়িবার সময়ে যে সামান্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, এই সহজ পরীক্ষায় তাহা জানা যায়।

একটু তুঁতের জলকে খুব গরম ধাতুর পাত্রের উপরে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলিতে থাকো। পাত্রে ঠেকিবা-মাত্র জল বাষ্প হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় বাষ্পে ও পাত্রে বিদ্যুতের লক্ষণ দেখা যায়। কাজেই, বাষ্পীভূত হইবার সময়ে যে, কতকগুলি জিনিষ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাহা স্বীকার করিতে হয়।

তোমরা বোধ হয় গল্পে শুনিয়াছ, কয়েক জাতি সমুদ্রের মাছের শরীর হইতে বিদ্যুৎ বাহির হয়। ইহা মিথ্যা নয়। বৈদ্যুত-যন্ত্র হইতে যেমন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, এই-সব মাছের শরীর হইতেও তেমনি স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কাইয়া চলে। কেবল ইহাই নয়, ইচ্ছা

করিলেই এই মাছেরা যখন-তখন গা হইতে বিদ্যুৎ বাহির করিতে পারে। তাই পোকামাকড় বা অন্য কোনো শিকারকে কাছে পাইলে তাহারা গায়ের বিদ্যুৎ দিয়া সে-গুলিকে মারিয়া আহার করে। দেবরাজ ইন্দ্র কোন্ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করেন তাহা বোধ করি তোমরা জানো। বজ্রই তাঁহার প্রধান অস্ত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে যখন-ইচ্ছা শত্রুর মাথায় বাজ ফেলিতে পারেন। সুতরাং সমুদ্রের ঐ মাছগুলিকে এক একটি ছোটো ইন্দ্র বলা যাইতে পারে। সমুদ্রের নানা মাছের মধ্যে কয়েক জাতীয় বাইন্ এবং টেপা মাছকেই বজ্রধর দেখা যায়। আবার তোমার আমার শরীরের স্নায়ু এবং পেশীকে উত্তেজিত করিলে এবং গাছপালার দেহের কোনো জায়গায় আঘাত দিলে খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মহাপণ্ডিত সার্ জগদীশচন্দ্র বসু এই বিদ্যুৎ লইয়া প্রাণী ও গাছ-পালার শারীর-ক্রিয়ার একতা দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে দেখ, জীবদেহ হইতেও বিদ্যুৎ জন্মে।

এইগুলি ছাড়া দুই রকম ধাতু-ফলককে সংযুক্ত করিয়া সংযোগের জায়গায় তাপ দিলে সুস্পষ্ট বিদ্যুতের

লক্ষণ দেখা যায়। কেবল ইহাই নয়, দুইটি বিভিন্ন ধাতুকে স্পর্শ করাইলেও কখনো কখনো বিদ্যুৎ জন্মে। তোমরা এই রকম বিদ্যুতের কথা পরে জানিতে পারিবে।

সমাপ্ত

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতকগুলি বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা

Amber ...	... স্ফটিক
Vulcanite	... ভল্‌কানাইট্
Telegraph	... টেলিগ্রাফ্
Telephone	... টেলিফোন্
Spark ...	... স্ফুলিঙ্গ
Electric pendulum	... বৈদ্যুত-দোলক
Attraction	... আকর্ষণ
Repulsion	... বিকর্ষণ
Positive Electricity	... ধন-বিদ্যুৎ
Negative Electricity	... ঋণ-বিদ্যুৎ
Inverse Ratio	... বিলোম অনুপা
Conductor	... পরিচালক
Non-Conductor	... অপরিচালক
Porcelain	... চীনা মাটি
Rubber ...	... রবার

Paraphin ··· ··· প্যারাফিন্
Electroscope ··· বিদ্যুৎ-দর্শক
Gold leaf ··· সোনার পাত
Varnish ··· ··· বার্নিশ
Magnet ··· ··· চুম্বক
Pole ··· ··· মেরু
Electric Cage ·· বৈদ্যুত খাঁচা
Density ··· ··· গাঢ়তা
Electric pressure or Tension···বৈদ্যুত চাপ
Molecule ··· ··· অণু
Atom ··· ··· পরমাণু
Electron ··· ··· ইলেক্ট্রন্
Proton ··· ··· প্রোটন্
Nucleus ··· ··· কেন্দ্র-সামগ্রী
Solar System ··· সৌর-জগৎ
Electrified ··· বিদ্যুৎ-যুক্ত
Elements ··· মূল পদার্থ
Induction ··· আবেশ
Induced ··· আবিষ্ট
Lines of force ··· বলরেখা

Field ··· ··· ক্ষেত্র
Electric Machine ··· বৈদ্যুত যন্ত্র
Electrophorus ··· বিদ্যুৎ-স্ফুরক যন্ত্র
Condenser ··· বিদ্যুৎ-সংগ্রাহক
Capacity ··· ··· ধারণ-শক্তি
Dielectric ··· রোধক বস্তু
Leyden Jar ··· লীডেন্ জার্
Cork ··· ··· কর্ক, ছিপি
Discharger ··· মেলক
Electric Oscillation ··· বৈদ্যুতিক আন্দোলন
Atompheric Electricity··· আকাশের বিদ্যুৎ
Lightning Conductor ··· বজ্র-বারক
Cumulus Cloud ··· স্তূপ মেঘ
Electric Potential ··· বৈদ্যুত শক্তি
Unit ··· ··· মাত্রা
Chemical Action ··· রাসায়নিক ক্রিয়া
Mechanical ··· যান্ত্রিক
Physiological ··· দৈহিক
Electro-magnet ··· বৈদ্যুত চুম্বক
Hydrogen ··· হাইড্রোজেন

Oxygen	...	অক্সিজেন
Uranium	...	ইউরেনিয়ম
Wireless Telegraph	...	তারহীন টেলিগ্রাফ্
Coil	...	কুণ্ডলী বা বেষ্টনী

রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলী

১ ।	গ্রহ-নক্ষত্র	১৸০
২ ।	প্রাকৃতিকী	২৲
৩ ।	বৈজ্ঞানিকী	১৷৷০
৪ ।	পোকা-মাকড়	২৲
৫ ।	প্রকৃতি-পরিচয়	১৷৷৴
৬ ।	বিজ্ঞানের গল্প	১৲
৭ ।	আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার	১৷০
৮ ।	পাখী	১৲
৯ ।	বাংলার পাখী	১৷৷০
০ ।	শব্দ	১৲
১ ।	মাছ ব্যাং সাপ	১৷৷০
২ ।	আলো	২৲
৩ ।	চুম্বক	৸০
৪ ।	তাপ	১৷০
৫ ।	গাছপালা	২৷৷০
৬ ।	স্থির-বিদ্যুৎ	১৷৷০
৭ ।	চল-বিদ্যুৎ	(যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান :—ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ।